পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৫৯ বর্ষ ॥ ১৫শ ও ১৬শ সংখ্যা

সালানা জলসা '৯৮ সংখ্যা

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮

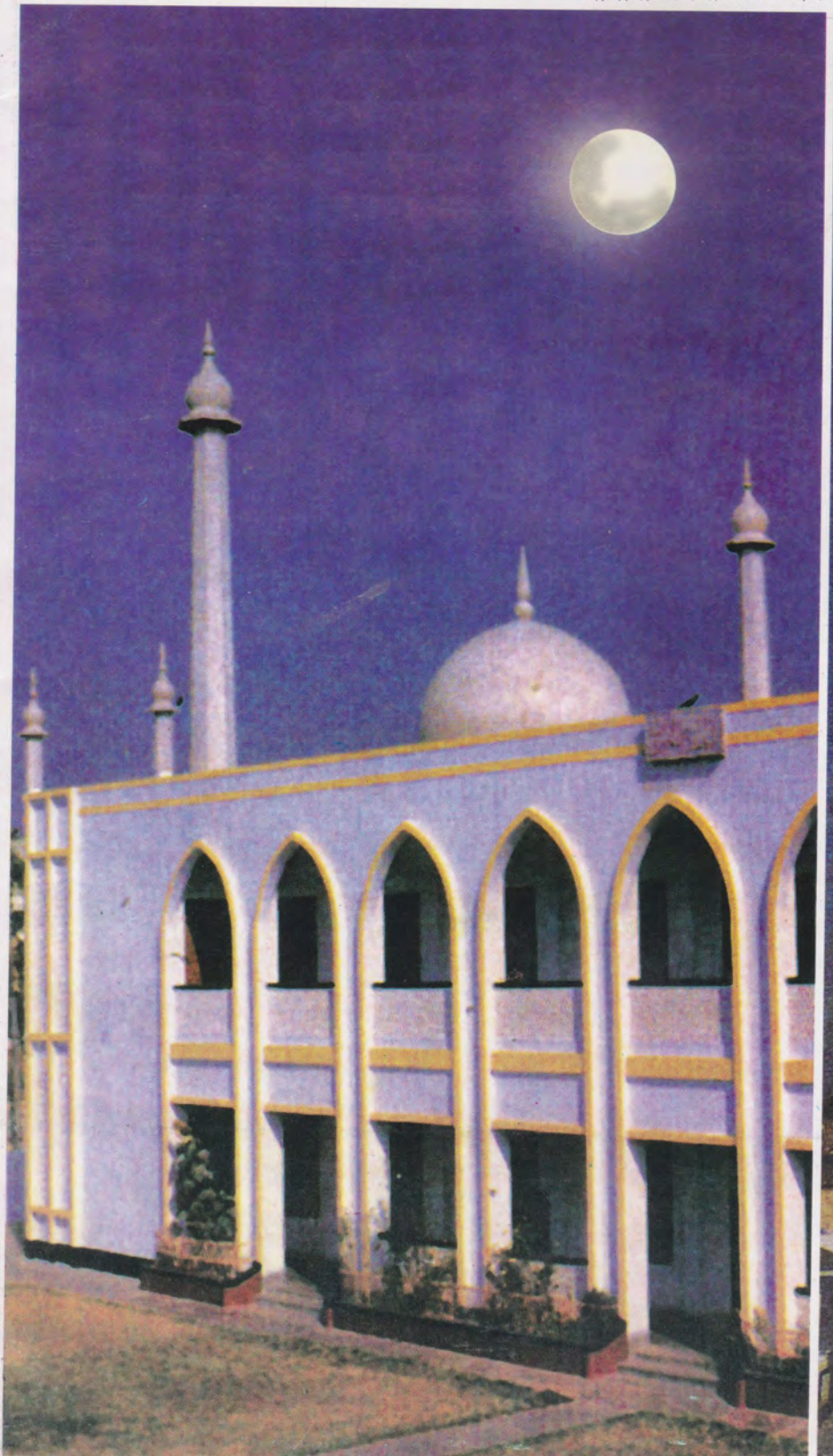

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

মহান আল্লাহ্‌তাআলা বাংলাদেশের ৭৪তম বার্ষিক জলসাকে সফলতা দান করুন !
এ উপলক্ষ্যে আমরা সকলের দোয়া প্রার্থী।

- আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
- মরিয়ম খাতুন
- মাহমুদা কায়ছার (নাজমা)
- মশিউর রহমান
- মুসাদ্দেক উর রহমান (মুবীন)
- মরহুম গোলাম সামদানী খাদেম
- মোহাম্মদ বশীর আহমদ
- শাহ্ গালিব বিন হাবিব
- ইঙ্গিত বিন্‌তে হাবিব ● কাশফী বিন্‌তে হাবিব
- ডাঃ এম. এ. আজিজ ● মিসেস আমেনা আজিজ
- এম. এ. সালাম ● মাদা সালাম
- ডাঃ এম. এ. বাতেন
- ডাঃ মোঃ আবুল হাসেম (শামীম)
- আবদুস সালাম (তারুয়া)
- মোহাম্মদ সাদেক ভূঁইয়া
- মাহমুদ আহমদ ● বশির আহমদ
- জিন্নাত ফেরদৌস
- মোতাহার আহমদ চৌধুরী
- মোহাম্মদ আবুল বাসার ভুঁইয়া
- মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান ভুঁইয়া
- মোহাম্মদ আউয়াল ভুঁইয়া
- সাদিয়া আফরীন রুমা ●ফৌজিয়া আফরীন লিমা
- সিদ্দীক রহীম ● মিসেস ফারাহ সিদ্দীক
- তসদিক আহমদ ভূঁইয়া
- মরহুম আহসান উল্লাহ্ সিকদার
- হাফিজ উদ্দিন আহমদ
- নুরুল ইসলাম মিঠু
- মিসেস তাসলিমা আজিজ
- সৈয়দা মারিয়া মাহফুজা
- মোহাম্মদ ফজলুর রহমান ● ফাহিমা ফজলুল্লাহ
- শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম
- মতিয়ার রহমান ● মলি
- ফিরোজা বেগম ● পলি
- কবির উদ্দিন আহমদ
- জুলফিকার হায়দার
- এ. কে. এম. ফেরদৌস
- মীর মোবাশ্বের আলী
- আহমদ তৌসিফ চৌধুরী
- রুমা চৌধুরী ● আহমদ তৌকিদ চৌধুরী
- নাজির আহমদ ভূঁইয়া
- রোকেয়া বেগম ● রফি আহমদ
- সৈয়দা হুমা আক্তার খাতুন ● মরহুম তারু মিয়া
- মরহুম ফকির ইয়াকুব আলী
- প্রকৌশলী মোঃ নূর-ই-এলাহী
- প্রফেসর তারেক সাইফুল ইসলাম
- আলহাজ্জ তবারক আলী
- অধ্যাপক রজিব উদ্দিন আহমদ
- আফরোজা চৌধুরী ● ইমরান আহমদ চৌধুরী
- হালীম আহমদ হাজারী
- জনাব শফিক আহমদ
- মিসেস মরিয়ম সুলতানা
- সোহেল আহমদ নীশু
- নাজ আফরীন সুলতানা ● মতিউর রহমান
- আব্দুল বারি ● মিসেস হাজেরা বারি
- মিসেস দুরুখ শাহ্ বানু
- শরীফ আহমদ ইঞ্জিনিয়ার ●মিসেস রেহানা আদিব
- সোয়েব আহমদ জুয়েল ● ইমরান আহমদ রিয়েল
- জোবায়ের শরীফ সজীব ● সাকিব রায়হান
- ডাঃ মাহবুবুল ইসলাম
- মিসেস রুমান পারভীন খাদিজা
- মিসেস মারজাহান ইসলাম পরশ
- মনিরা ইসলাম পরাগ
- ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্
- মোহাম্মদ আব্দুল হাদী
- মিসেস আঞ্জুমান আরা হাদী
- মরহুম মাসুদুল হক সিরাজী
- বেগম মহসিনা বেগম সিরাজী
- খালিদ আহ্‌মেদ সিরাজী
- মামদুদা খালিদ সিরাজী (শেলী)
- ফারিহা ফাইরুজ সিরাজী
- আবরার মাসুদ সিরাজী
- নাসির আহ্‌মেদ সিরাজী (টিটো)
- মোহাম্মদ জুলফিকার আলম
- মিসেস জেসমিন রৌশনী
- সৈয়দ সরফরাজ আহমদ
- হেলাল উদ্দিন আহমদ ● জালাল উদ্দিন আহমদ
- সায়েরা আহমদ (ডেইজী) ●মাহবুব উল্লাহ সিকদার
- মইন উদ্দিন আহমদ ● চৌধুরী আতিকুল ইসলাম
- আবু নাসির ● কামাল পাশা
- মোহাম্মদ বোরহান উল হক
- মরহুম বদর উদ্দিন আহমদ
- রোকেয়া বেগম ● শরীফা খাতুন
- মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ● মোহাম্মদ ইদ্রিস
- তাহেরা জুলফিকার
- মোহাম্মদ আলী ● আমিনা আলী
- ফজলে আলী ● সাইদা আলী
- তানিয়া আলী
- মরহুম ডাঃ নূর হোসেন ● মিসেস সুফিয়া খাতুন
- ডাঃ সিরাজুল ইসলাম ●মরহুম মোরশারফ হোসেন
- জহুরা খাতুন ● সালেহা খাতুন
- আমীরুল হাসান ● জাহানারা বেগম
- রাহাতুল হাসান ● সাফী হুসায়েন
- মাহমুদুল হাসান ● সালমা সাবেরা
- নাঈমা হাসান

আল্লাহ্‌তাআলার খাস ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৭৪তম সালানা জলসার আয়োজন করছি, আলহামদুলিল্লাহ্। এই জলসার মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কর্তৃক মহান আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সালানা জলসার আলোকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এই সালানা জলসার আয়োজন করে থাকে। তাই এ জলসায় যারা যোগদান করেন তারা ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মেহমান ; প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌তাআলার মেহমান। আমি আমীর হিসেবে জামাতের একজন খাদেম মাত্র। তাই জলসায় যোগদানকারী মেহমানদের উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ঃ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর দোয়া ঃ

'যারা এ লিল্লাহী জলসার উদ্দেশ্যে সফর করেন, খোদা তাদের সহায় হউন, অসীম প্রতিদান দিন, তাদের উপর দয়া পরবশ হউন, তাদের সকল সমস্যা ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটান, সকল দুঃখ-কষ্ট হতে তাদিগকে নিষ্কৃতি দান করুন, তাদের সমুদয় শুভ কামনা ও কার্য-সিদ্ধির পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করে দিন এবং হাশরের দিনে তাহাদিগকে খোদা তাঁর সেই সকল বান্দাদের সাথে উত্থিত করুন যাদের উপর তাঁর ফযল ও রহমত বর্ষিত হয়েছে এবং সফর সমাপ্তি পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের স্থলাভিষিক্ত হউন।

হে খোদা ! হে মর্যাদাবান ও দানশীল এবং পরম দয়াবান ও সমস্যা সমাধানকারী খোদা ! এই সবগুলি দোয়াই তুমি কবুল কর এবং আমাদিগকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপর উজ্জ্বল ঐশী নিদর্শনাবলী সহকারে প্রাধান্য দান কর। কেননা, সকল শক্তি -সামর্থ্যের অধিকারী একমাত্র তুমিই ; আমীন, সুম্মা আমীন।" (বিজ্ঞাপন ঃ ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯২ইং)

যারা কষ্ট স্বীকার করে জলসায় উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ্‌তাআলা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন একই সাথে পাক্ষিক আহমদীর গ্রাহক এবং সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দকে জানাই মোবারকবাদ।

সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৫৯ বর্ষ ॥ ১৫শ ও ১৬শ সংখ্যা

৩রা ফাল্গুন ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ❑ ১৭ শওয়াল ১৪১৮ হিঃ কাঃ
১৫ই তবলীগ, ১৩৭৭ হিঃ শাঃ ❑ ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

সম্পাদক
মকবুল আহমদ খান

সহকারী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহ উদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মদ শামসুর রহমান

সহকারী হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ, কে, রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
জাভেদ এ, মতিন	-	ক্যালিফর্নিয়া
আব্দুর রব	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ	-	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	-	হংকং

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৩৪১৪

সম্পাদকীয়

সালানা জলসা-৯৮

বর্তমান বিশ্ব প্রবলভাবে অবক্ষয়ে আক্রান্ত। কুরআন মজীদের শিক্ষা ও আদর্শের সঠিক ব্যাখ্যা ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর সফল বাস্তবায়নই অবক্ষয়ের রোধ ও মানুষকে পাক পবিত্র করার আল্লাহ্ প্রদত্ত পথ-সিরতে মুস্তাকীম। ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ সিরতে মুস্তাকীমের আহ্বানকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে সর্বশক্তিমান ও সর্বকরুণার আধার আল্লাহ্ ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদরূপে প্রেরণ করেছেন। সুষ্ঠু ও ব্যাপকভাবে এ মহান দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে তাঁর অন্যতম কর্মকান্ড হিসেবে তিনি সালানা জলসার প্রবর্তন করেন কাদিয়ানে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। মাত্র ৭৫ জন পুণ্যাত্মা নিয়ে সেদিন যে জলসার শুভারম্ভ হয়েছিলো আজ তারই আলোকে প্রতিচ্ছবিস্বরূপ এখন সারা বিশ্বের জামাতগুলোতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ও স্থানীয় পর্যায়ে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে প্রতি বছর। এতে হাজারের কোঠা পেরিয়ে এখন লক্ষ লক্ষ লোকও সমবেত হয়ে থাকে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ৭৪ তম সালানা জলসার তারিখ ধার্য হয়েছে ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ইং। এ জলসায় যোগদানকারী মেহমানগণকে— যুগ-মসীহ্ (আঃ)-এর মেহমানগণকে আমরা জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। এ মহতি জলসা উপলক্ষ্যে আমরা পাক্ষিক আহমদীর বর্তমান সংখ্যাকে পাঠকদের হাতে পৌঁছে দিতে পেরে নিজদেরকে ধন্য মনে করছি। বাংলার আনাচে কানাচে থেকে অর্থ ও মূল্যবান সময় ব্যয় করে যেসব মোজাহেদীন এ জলসায় যোগদান করছেন তাদের কষ্ট ও শ্রম তখনই সার্থক হবে যদি তারা এ আধ্যাত্মিক জলসার উদ্দেশ্যাবলীকে দৃষ্টিপটে রেখে এ দিন কয়টি অতিবাহিত করেন অর্থাৎ জলসার প্রত্যেকটি অধিবেশনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক খোরাক সম্বলিত বক্তৃতাগুলো মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন, শান্তি-শৃঙ্খলার সাথে ব্যবস্থাপনার সাথে সহযোগিতা করেন এবং সর্বোপরি দোয়ার মধ্যে থেকে একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে দিনগুলো অতিবাহিত করেন। এ দিনগুলোতে আমাদের অবশ্যই আপোষে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সুদৃঢ় করা, বিয়ে-সাদীর ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং সর্বোপরি তবলীগের কাজকে বেগবান ও তরান্বিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সকলেই অবগত আছেন যে, হুযূর (আইঃ)-এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশেও বিরুদ্ধবাদীদেরকে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। সুতরাং সে বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে সামগ্রিক দোয়ার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেবার প্রয়োজন অনস্বীকার্য, আমরা তা যেন ভুলে না বসি।

পরিশেষে আমরা পরম করুণাময়ের নিকট দোয়া করি তিনি যেন আমাদের সকলের দুর্বলতা ও ভুলত্রুটি ক্ষমা করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) জলসায় যোগদানকারীদের জন্যে যে দোয়া করেছেন তা আমাদের সকলের জীবনে পূর্ণ হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন, আমীন।

এখানে পাক্ষিক আহমদীর ব্যাপারে তথ্যগত একটি বিষয় সম্বন্ধে উল্লেখ করতে চাই। আহমদী 'মাসিক' হিসেবে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে থেকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হওয়া আরম্ভ হয়। এর আগে বেশ কয়েক বছর ধরে 'আহমদীয়া বুলেটিন' প্রকাশিত হতো। এখন যে পর্যায় চলছে তা ১৯৩৮ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে কলকাতা থেকে পাক্ষিক হিসেবে প্রকাশিত হওয়া আরম্ভ হয়। ঐ হিসেবে পাক্ষিক আহমদী এখন ৬০ বছর পূর্ণ হয়ে ৬১ বছরে পদার্পণ করেছে। আমরা যথাসময়ে ইহা সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ্।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মজীদ (তফসীর সহ)	'কুরআন মজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ	অনুবাদ ও ব্যাখ্যা– মাওলানা সালেহ আহমদ	৪
❑ অমৃতবাণীঃ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) 'রোয়েদাদ জলসা দোয়া' পুস্তক থেকে	অনুবাদ-সাহেবুল কাহ্ফ	৫-৬
❑ কুরআনী জিন্দেগী	সংকলন– খোন্দকার আজমল হক	৭
❑ হাকীকাতুল ওহীঃ মূল হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী,	অনুবাদ-নাজির আহমদ ভূঁইয়া	৮-১০
❑ ওয়াকফে জাদীদ ও নবাগতদের তরবীয়ত সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের্ রাবে' (আইঃ)	অনুবাদ-মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকি	১১-১৬
ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)		
❑ মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক মহান ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী	মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৭-১৮
❑ সালানা জলসা উপলক্ষে	খোলাফাগণের মূল্যবান বক্তব্য	১৯-২০
❑ চিত্রে জামাতের কর্মকান্ড		২১-২৪, ৩৩-৩৬ ও ৫৩-৫৬
❑ খতমে নবুওয়ত ও আহ্মদীয়া জামাত মূলঃ আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর লায়েলপুরী	ভাষান্তর-এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার (মরহুম)	২৫-২৬
❑ কবিতা ঃ করুণা	বেগম জাহানারা রাজা	২৬
❑ উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২৭-২৮
❑ আমি কেন আহমদী হলাম	শেখ মোশারফ হোসেন	২৮
❑ বয়াত গ্রহণকারীদের খেদমতে কিছু কথা	অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ	২৯-৩০
❑ আহমদীয়তের সত্যতার জ্বলন্ত নিদর্শন	শাহ্ নজির আহমদ	৩১-৩২
❑ যিক্রে ইলাহীর স্বরূপ	মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩৭-৪২
❑ আপনি কি 'কাদিয়ানী' জামাত সম্পর্কে জানতে চান?	মোহাম্মদ আজিজুল হক	৪৩-৪৪
❑ অষ্ট্রেলিয়ায় আহমদীয়তের ইতিকথা	মাওলানা মাহমুদ আহমদ	৪৫-৪৬
❑ ইনকিলাবে হাকীকী (প্রকৃত বিপ্লব) মূলঃ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী, আল্ মুসলেহুল মাওউদ(রাঃ)	অনুবাদ-মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৪৭-৪৮
❑ ধর্মের নামে রুসুম রেওয়াজ ও কদাচার	নাজির আহমদ ভূঁইয়া	৪৯-৫১
❑ আপনার পত্র পেলাম		৫২
❑ ছোটদের পাতা (রোযা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য)	পরিচালক-মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৫৭-৫৮
❑ মুবাহালা অব্যাহত থাকার ঘোষণা ঃ সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	অনুবাদ – মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫৯-৬৬
❑ আল্লাহ্তাআলার পবিত্র সত্তা	সংকলন ও অনুবাদ- শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	৬৭-৭০

প্রচ্ছদ পরিচিতি

বামে-আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় মসজিদ। নেগরান বোর্ডের সদর থাকাকালীন ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে কাদিয়ানের ইট দ্বারা এ ভিত্তি রাখেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)। ১৯৮১-৮২ সালে এর নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়।

মিনারাতুল মসীহ্ ঃ দারুল আমান কাদিয়ানে অবস্থিত মিনারাতুল মসীহ্। হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ মাওউদ আলায়হেস্ সালাম ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ইহার ভিত্তি রাখেন। হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব (রাঃ)-এর খেলাফতকালীন ১৯২৩ সনে শ্বেত পাথর দ্বারা এর নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়। কল-কারখানায় ধোঁয়ায় এর শ্বেত পাথর নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় এর পাথরগুলোকে বদলানোর সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন আমাদের এক বাঙ্গালী ভাই মোহাম্মদ ইয়ামীন সাহেব। আল্লাহ্তাআলা তাঁকে এর উত্তম পুরস্কার দান করুন।

সূরা আন্ নিসা-৪

১৪৩। নিশ্চয় মোনাফেকরা আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করিতে চাহে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতারণার শাস্তি দিবেন, এবং যখন তাহারা নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তাহারা শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায়, তাহারা লোকদিগকে দেখায়, এবং তাহারা আল্লাহ্‌কে খুব কমই স্মরণ করে।

১৪৪। তাহারা ইহার মধ্যে দোদুল্যমান ৬৮৮ অবস্থায় রহিয়াছে– তাহারা ইহাদের (মো'মেনগণের) মধ্যেও নহে এবং তাহাদের (কাফেরদের) মধ্যেও নহে। আর আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন, তুমি তাহাদের জন্য কখনও কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

১৪৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা মো'মেনগণকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে কখনও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ কর্তৃক খোলাখুলি অভিযোগ আনিবার সুযোগ দিতে চাহ?

১৪৬। নিশ্চয় মোনাফেকরা আগুনের নিম্নতম স্তরে ৬৮৯ অবস্থান করিবে এবং তুমি তাহাদের জন্য কখনও কোন সাহায্যকারী পাইবে না।

১৪৭। তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা তওবা করে এবং সংশোধন করে এবং আল্লাহ্‌কে মযবূতভাবে ধরে এবং তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য তাহাদের দীনকে আন্তরিকভাবে পালন করে – ইহারাই মো'মেনগণের অন্তর্ভুক্ত। এবং অচিরেই আল্লাহ্ মো'মেনদিগকে মহাপুরস্কার দান করিবেন।

১৪৮। কেনইবা আল্লাহ্ তোমাদিগকে আযাব দিবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন ? আল্লাহ্ অতীব গুণগ্রাহী, ৬৯০ সর্বজ্ঞানী।

১৪৯। আল্লাহ্ মন্দ কথার প্রকাশকে ৬৯১ ভালবাসেন না, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাহার উপর যুলুম করা হইয়াছে, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

১৫০। যদি তোমরা কোন পুণ্যকর্ম প্রকাশ কর, অথবা উহা গোপন কর, অথবা কোন দোষত্রুটি ক্ষমা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ বড়ই মার্জনাকারী, সর্বশক্তিমান।

১৫১। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিতে চাহে এবং বলে, 'আমরা কতকের উপর ঈমান আনি এবং কতককে অস্বীকার করি ; এবং তাহারা চাহে যেন তাহারা ইহার মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে ; ৬৯২

১৫২। ইহারাই প্রকৃত কাফের এবং আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

১৫৩। এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনে এবং তাহাদের কাহারও মধ্যে পার্থক্য করে না, ইহারাই ঐসকল লোক যাহাদিগকে তিনি শীঘ্রই তাহাদের পুরস্কার দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

৬৮৭। মোনাফেকগণ আল্লাহ্‌কে তো কখনই ঠকাইতে পারে না। তবে তাহারা মহানবী (সাঃ)-কে প্রতারণা করিয়া ঠকাইতে চাহে, যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌রই নিয়োজিত ব্যক্তি। যত ষড়যন্ত্রই তাহারা নবী করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে করে, উহার সবগুলিই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যকে বানচাল করিবার জন্য তাহারা করিয়া থাকে; তাই তাহাদের ষড়যন্ত্র ও প্রবঞ্চনামূলক কার্যাবলীর জন্য আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। ২ঃ১৬ দেখুন।

৬৮৮। শব্দগুলিতে এইরূপ অর্থ আছে। "বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝে দোদুল্যমান বা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মাঝখানে দোলায়মান"।

৬৮৯। কুরআন মোনাফেকদিগকে অতি ঘৃণার সহিত নিন্দা করিয়াছে। ফলে কাহারও এই যুক্তি দেখাইবার উপায় নাই যে, কুরআন তলোয়ারের জোরে ধর্ম-প্রচার করিতে মুসলমানকে উৎসাহিত করে। কেননা, তলোয়ারের জোরে কোন ব্যক্তিকে মুসলমান করিলে, সে মুসলমান না হইয়া বরং মোনাফেকই হইবে।

৬৯০। আল্লাহ্‌তা'লার 'শাকের' (শোক্‌রকারী) হওয়ার অর্থ ক্ষমাকারী, সন্তোষ প্রকাশকারী, প্রশংসাকারী ও গুণগ্রাহী হওয়া এবং সৎকর্মের পুরস্কারদাতা হওয়া বুঝায় (লেইন)।

৬৯১। ইসলাম জনসমক্ষে অপরের নিন্দা করা বা অপরকে গালাগালি করা নিষেধ করে। তবে, অত্যাচারিত ব্যক্তি আক্রান্ত অবস্থায় চীৎকার করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, যাহাতে অপরে আসিয়া তাড়াতাড়ি সাহায্য করিতে পারে। সে বিচারালয়ে বিচার-প্রার্থীও হইতে পারে। কিন্তু কোনও অবস্থায় দুর্নাম বা কুৎসা করিয়া বেড়াইতে পারে না।

৬৯২। এমন লোক আছে, যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে কিন্তু তাঁহার রসূলগণকে মানে না অথবা রসূলগণের মধ্যে কাহাকেও মানে কাহাকেও মানে না, অথবা একই রসূলের কোন দাবীকে মানে, কোন দাবীকে মানে না। তাহারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মধ্য-পথে থাকিতে চায়। তাহারা বিশ্বাসী নহে। প্রকৃত বিশ্বাস সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ চায়, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলগণের দাবীগুলির প্রতি সম্পূর্ণতম আস্থা স্থাপনের নাম ঈমান বা বিশ্বাস।

(চলবে)

সংশোধনী : গত সংখ্যায় অনবধানতাবশতঃ 'সূরা নিসা-৪'-এর বদলে 'সূরা আন্‌নাস-৪' ছাপা হয়েছে। এজন্যে আমরা দুঃখিত।

নামায

কুরআনঃ اُتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ۝

অর্থাৎ এই কিতাব হতে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয় তা তুমি পাঠ কর। এবং নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দকর্ম হতে বিরত রাখে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌র স্মরণ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন। *(সূরা আনকাবূত : ৪৬ আয়াত)*

হাদীস ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ لَهٗ خَالِصًا وَّابْتُغِیَ بِهٖ وَجْهُهٗ

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায এক জুমুআ হতে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত গুনাহ্‌সমূহের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত)। (ইহা কাফ্‌ফারা হিসেবে চলতে থাকবে) যতক্ষণ না সে কবীরা গুনাহ্ করে (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যাঃ নামায ইসলামের এক অন্যতম রুকন বা ভিত্তি। নামায মুসলমানের জীবনের অলংকার। ইহা যে শুধু সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে তা নয় বরং ইহা তার দেহ ও মনের তৃপ্তি ও প্রশান্তি। নামায মু'মিনের আধ্যাত্মিক খাদ্য যা খোদার তরফ হতে প্রতিদিন পাঁচবার গ্রহণ করার জন্য উপস্থাপিত হয়। নামায মু'মিনের প্রাণ ও হৃদয়ের প্রশান্তি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "নামায প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরয। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদা একটি গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করলো। ইসলাম গ্রহণের পর তারা বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের নামায মাফ করে দিন। কারণ আমরা ব্যবসায়ী, চতুষ্পদ প্রাণীদের ব্যবসাতে ব্যস্ত থাকায় আমাদের কাপড়-চোপড় নোংরা থাকে আর আমরা সময়ও পাই না। এর উত্তরে তিনি (সাঃ) বললেন, দেখো যদি নামায না থাকে তবে বাকী কিছুই রইল না। উহা ধর্মই নয় যেখানে নামায নেই। নামায কী? ইহা হলো বিনয় ও আকুতির সাথে নিজ দুর্বলতাকে খোদার সামনে পেশ করা এবং উহা দূর করার জন্যে ও নিজ প্রয়োজনীয়তা মিটানোর জন্যে তাঁর কাছে দোয়া করা। (মলফুযাত, পঞ্চম খণ্ড, ২৫৩ পৃঃ)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এক জায়গায় লিখেন, "দেহকে ঘষে ঘষে ধৌত করা কোন কঠিন কাজ নয়। হৃদয়কে যে ধুয়ে পরিষ্কার করে সে-ই খোদার দরবারে পূতঃ-পবিত্র। এর দ্বারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বুঝাতে চেয়েছেন যে, নামায দ্বারা যদি হৃদয়কে পবিত্র করতে পারো তবেই উহা নামায। নতুবা উহা খোদার নিকট নামায নয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নামাযের ব্যাপারে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, নামায-ই হলো ধর্ম। ইহা ব্যতিরেকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বলতে আমাদের পরিচয়ই বা কী হবে? ইদানিংকালে আমাদের প্রিয় ইমাম নামাযের উপরে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে নামায কায়েম করার আহ্বান জানাচ্ছেন। আমরা যেন সবাই সত্যিকার অর্থে নামাযী হতে পারি আল্লাহ্ আমাদের সেই তৌফীক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী

জলসার গুরুত্ব

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, "মহান আল্লাহ্‌তাআলার কিছু উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন ভ্রমণরত ফিরিশ্‌তা সর্বদা এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন যেখানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয়। অতএব যখন তাহারা এমন মজলিসের সন্ধান পান যেখানে (আল্লাহ্‌র) যিক্‌র হইতে থাকে, তাঁহারা তাহাদের সহিত বসিয়া পড়েন এবং নিজেদের পাখা দ্বারা তাহারা একে অপরকে আবৃত করেন। এমনকি তাহাদের এবং নিকটবর্তী আকাশের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ হইয়া যায়। (টীকা ঃ এই রকম মজলিসের উপর খোদাতাআলা যে কল্যাণ ও বরকত বর্ষণ করিয়া থাকেন তাহাই রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম রূপকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না)। অতঃপর যখন লোকেরা ঐ মজলিস্ হইতে উঠিয়া যায় তখন ফিরিশ্‌তাগণও আকাশে চলিয়া যায়। (সেখানে) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যিনি তাহাদের অপেক্ষা বেশী জানেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ?' তখন তাহারা উত্তর দেন, 'আমরা তোমারই ঐ সকল বান্দার নিকট হইতে আসিয়াছি, যাহারা পৃথিবীতে তোমার গুণকীর্তন করিতেছিল, তোমার একত্ব ঘোষণা করিতেছিল, তোমার প্রশংসায় মুখরিত ছিল এবং তোমার নিকট যাচ্‌ঞা করিতেছিল।' তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তাহারা আমার নিকট কি যাচ্‌ঞা করিতেছিল'? ফিরিশ্‌তাগণ বলেন, 'তাহারা তোমার নিকট তোমার জান্নাত যাচ্‌ঞা করিতেছিল'। আল্লাহ পুনঃ প্রশ্ন করেন, 'তাহারা কি আমার জান্নাত দেখিয়াছে?' ফিরিশ্‌তাগণ উত্তর দেন, 'হে প্রভু! না তাহারা দেখে নাই।' তিনি বলেন, 'কী অবস্থা হইত যদি তাহারা আমার জান্নাত দেখিত!' তাহারা বলেন, 'তাহারা তোমার নিকট তোমার আশ্রয়ও প্রার্থনা করিতেছিল।' তিনি বলেন, 'তাহারা কি আমার আগুন দেখিয়াছে?' তাহারা বলেন, 'না তাহারা তাহা দেখে নাই।' তিনি বলেন, 'তাহাদের কী অবস্থা হইত যদি তাহারা আমার আগুন দেখিত!' তখন তাহারা বলেন, 'তাহারা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিল।' তিনি বলেন, 'আমি অবশ্যই তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। তাহারা আমার কাছে যাহা যাচ্‌ঞা করিয়াছে তাহা আমি তাহাদিগকে দান করিলাম এবং তাহারা যাহা হইতে আশ্রয় চাহিয়াছিল তাহাদিগকে আশ্রয় দিলাম।' তখন তাহারা বলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের মধ্যে একজন তো অত্যন্ত গুনাহ্‌গার ছিল যে ঐ জায়গা অতিক্রম করিতেছিল এবং সে তাহাদের সহিত দর্শকের ন্যায় বসিয়া গেল।' 'তিনি বলেন, 'আমি তাহাকেও ক্ষমা করিয়া দিলাম; কেননা, তাহারাতো ঐ সকল আশিস-প্রাপ্ত লোক যে, তাহাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন সেও বঞ্চিত হইবে না।' *(মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্‌র)*।

অমৃত বাণী

দোয়ার জলসার কার্যবিবরণী

[ইহা ১৯০০ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ঘোষণা অনুযায়ী কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়।]

(শেষ কিস্তি)

এখন আমি **আরও একটি জরুরী কথা বলতে চাই**। আর উহা হলো এই যে, **সাম্রাজ্যকে অনেক অভিযান করতে হয়** আর উহাও প্রজাদের বাঁচানো ও রক্ষা করার জন্যে হয়ে থাকে। তোমরা দেখেছো যে, **আমাদের সরকারকে** সীমান্তে বহুবার যুদ্ধ করতে হয়েছে। যদিও সীমান্তের লোকেরা মুসলমান কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে তারা ন্যায়ের ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। ইংরেজদের সাথে তাদের যুদ্ধ করা কোন ধর্মীয় কারণে বা ধর্মীয় দিক থেকে সঠিক নয়। আর তারা সত্যিকার অর্থে ধর্মের জন্যে লড়াই করছে না। তারা কি এই আপত্তি তুলতে পারে যে, সরকার মুসলমানদের স্বাধীনতা দিয়ে রাখে নি? নিঃসন্দেহে দিয়ে রেখেছে। আর এমন স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে যার দৃষ্টান্ত কাবুল ও কাবুলের আশপাশ থেকেও পাওয়া যেতে পারে না। আমীরের অবস্থা ভাল শুনা যাচ্ছে না। এসব সীমান্তের পাগলদের লড়াই করানোর মধ্যে পেট ভরা ব্যতিরেকে কোন কারণ নেই। দশ বিশ টাকা পেলেই তাদের মধ্যে গাজী হওয়ার সাধ মিটে যায়। এসব লোক যালেম স্বভাবের এবং তারা ইসলামের বদনাম করছে। **ইসলাম** যুগের শাসক ও অনুগ্রহপরায়ণ ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করে থাকে। এসব হেয় প্রকৃতির লোক নিজেদের পেটের জন্যে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙঘন করে। আর তাদের বদমায়েশি, ঔদ্ধত্য ও কসাইগিরির বড় প্রমাণ হোল এই যে, তারা একটি রুটির বদলে অনায়াসে একটি লোককে হত্যা করতে পারে। আমাদের সরকারকে আজকাল এমনই ট্রান্সভাল নামক ছোট একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাথে সংঘর্ষ করতে হচ্ছে। ঐ রাজ্যটি পাঞ্জাব থেকে বড় নয়। আর ইহা তাদের একেবারেই নির্বুদ্ধিতা যে, তারা এমন এক বিরাট সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষ আরম্ভ করেছে। কিন্তু এখন যখন সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েই গেছে প্রত্যেক মুসলমানদের কর্তব্য যে, ইংরেজদের সফলতার জন্যে দোয়া করা। আমাদের ট্রান্সভালের কি প্রয়োজন? আমাদের ওপরে যাদের হাজারো অনুগ্রহ রয়েছে তাদের মঙ্গল কামনা করা আমাদের জন্যে অবশ্য কর্তব্য। এক প্রতিবেশীর এতটা অধিকার আছে যে, তার কষ্টের কথা শুনে যেখান প্রাণ গলে যায় সেক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারের বিশ্বস্ত সৈন্যদের বিপর্যয়ের কথা শুনে আমাদের প্রাণে কি এমন ব্যথা লাগবে না? আমার দৃষ্টিতে তার প্রাণ বড়ই কৃষ্ণবর্ণের যে কিনা গভর্ণমেন্টের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে মনে করে না। স্মরণ রাখো! কুষ্ঠরোগ কয়েক প্রকার হতে পারে। এক প্রকার শরীরে লেগে যায় যাকে কুষ্ঠ-রোগ বলা হয়। এক কুষ্ঠ রোগ হলো যা অন্তরে লেগে যায়। যার কারণে উহার স্বভাব খারাপ হয়ে যায় যে, লোকের খারাপ কাজে আনন্দ আর কল্যাণের

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)

কাজে দুঃখ-কষ্ট পায়। সুতরাং এরকম এক ব্যক্তি আমাদের ওখানে বাজারে থাকতো। যদি কারও ওপরে কোন মোকদ্দমা রুজু হয়ে যেতো সে জিজ্ঞেস করতো যে, মোকদ্দমার অবস্থা কী? যদি কেউ বলে দিতো যে, **সে মুক্তি পেয়ে গেছে বা অবস্থা ভালো এতে তার মাথায় যেন বাজ পড়তো** এবং সে চুপ মেরে যেতো। আর যদি কেউ বলে দিতো যে, **আসামী শাস্তি পেয়েছে তাহলে সে খুব খুশী হতো এবং তার নিকট বসে সারাটা ঘটনা শুনতো। মোট কথা মানুষের স্বভাবের মধ্যে কারও অকল্যাণ কামনা করার এমন উপকরণ নিহিত যে, সে খারাপ সংবাদ শুনতে আগ্রহী এবং মানুষের অকল্যাণের ওপরে আনন্দ লাভ করে।** কেননা, শয়তানের আগুন তার মধ্যে নিহিত। অতএব অমঙ্গল কামনা কোন মানুষের পক্ষেই ভাল নয়; যেখানে অনুগ্রহপরায়ণ রয়েছে। সুতরাং আমি আমার জামাতকে বলছি যে, তারা যেন এরূপ লোকের দৃষ্টান্ত অবলম্বন না করে বরং পরিপূর্ণ সহানুভূতি ও সত্যিকারের কল্যাণকামী হওয়ার সাথে সাথে বৃটিশ সরকারের সফলতার জন্যে দোয়া করে এবং কার্যতঃ ও বিশ্বস্ততার আদর্শ দেখায়। আমরা একথা কোন পারিতোষিক বা পুরস্কারের খাতিরে বলছি না, আমাদের পার্থিব পারিতোষিক, পুরস্কার ও খেতাবাদির কি প্রয়োজন? আমাদের নিয়্যত সর্বজ্ঞানী খোদা অবহিত আছেন। **আমাদের কাজ কেবল তাঁর উদ্দেশ্যে এবং তাঁরই নির্দেশে। তিনিই আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, উপকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আমরা এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিজেদের মহান প্রভু ও অভিভাবকের আনুগত্য করি আর তাঁর নিকটেই প্রতিদান প্রত্যাশা করি। সুতরাং তোমরা যারা আমার জামাতের লোক, তারা নিজেদের অনুগ্রহপরায়ণ সরকারের যথাযথ মর্যাদা দান করো।**

এখন আমি চাই যে, ট্রান্সভাল যুদ্ধের জন্যে আমরা দোয়া করি। এ পর্যন্তই।

এর পরে **হযরত আকদস** খুবই আবেগ ও নিষ্ঠার সাথে দোয়ার জন্যে হাত উঠান এবং উপস্থিত সকলে যাদের সংখ্যা এক হাজার থেকে অধিক, দোয়া করেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিজয় ও সফলতার জন্যে দোয়া করেন। এর পরে হযরত আকদস প্রস্তাব করেন যে, আঘাতপ্রাপ্তদের জন্যে বৃটিশ সরকারের নিকট চাঁদা পাঠানো আবশ্যক। তজ্জন্য একটি বিজ্ঞাপনও প্রচার করা হয়েছে। উহা নিম্নরূপ।

লেখক- মির্যা খোদাবখ্শ, কাদিয়ান

নিজ জামাতের জন্যে জরুরী বিজ্ঞাপন

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

নাহ্মাদুহূ ওয়া নুসাল্লী 'আলা রসূলিহিল কারীম

যেহেতু হিন্দুস্থানের মুসলমানদের ওপরে সাধারণভাবে এবং পাঞ্জাবের মুসলমানদের ওপরে বিশেষভাবে ব্রিটিশ সরকারের বড় বড় অনুগ্রহ রয়েছে তাই মুসলমানগণ নিজেদের এই অনুগ্রহপরায়ণ সরকারের যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তা কমই। কেননা, মুসলমানগণ এখন পর্যন্ত ঐ যুগকে বিস্মৃত হয়নি যখন তারা শিখ জাতির হাতে একটি জ্বলন্ত তন্দুরের মধ্যে নিপতিত ছিলো। আর তাদের অত্যাচারী হাত দ্বারা মুসলমানদের পার্থিব জীবনই ধ্বংস হচ্ছিলো না বরং তাদের ধর্মীয় অবস্থা এথেকেও খারাপ ছিলো। ধর্মীয় কর্তব্যাদি পালন করা দূরে থাকুক কখনও কখনও নামাযের আযান দিলে প্রাণে বধ করা হোত। এমন বিলাপের নিকৃষ্ট অবস্থায় আল্লাহ্তাআলা অনেক দূর থেকে এই কল্যাণময় সরকারকে আমাদের মুক্তির জন্যে রহমতের বারিধারার ন্যায় পাঠিয়ে দিলেন। যে এসে কেবল এ অত্যাচারীদের খপ্পর থেকেই রক্ষা করেনি বরং সর্বপ্রকার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করে জীবন নির্বাহের সর্বপ্রকার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করে জীবন নির্বাহের সর্বপ্রকার জিনিষপত্র যোগান দিয়েছে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা এতটা দিয়েছে যে, আমরা বিনা বাধায় নিজেদের নির্ধারিত ধর্মের প্রচার খুবই সহজসাধ্য পদ্ধতিতে করতে পারি। আমরা ঈদুল ফিতরের অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তো ইংরেজী পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে এবং অবশিষ্ট বিস্তারিত বিবরণ অচিরেই আল্লাহ্র ইচ্ছায় মির্যা খোদা বখ্শ সাহেব প্রকাশ করছেন। আমরা এ পবিত্র ঈদ অনুষ্ঠানে সরকারের অনুগ্রহরাজির উল্লেখ করে নিজের জামাতের যারা এ সরকারের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা পোষণ করে, এবং অন্যান্য লোকদের ন্যায় কপটতাপূর্ণ জীবন যাপন করা পাপ মনে করে-দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, তোমরা সকলে আন্তরিকভাবে নিজেদের এ সদাশয় সরকারের জন্যে দোয়া করো যেন আল্লাহ্তাআলা তাদের এ যুদ্ধে যা কিনা ট্রান্সভালে চলছে, মহান সফলতা দান করে। তদুপরি এ কথাও বলেছি যে, সত্য আল্লাহ্তাআলার পরে ইসলামের মহান কর্তব্য হলো সৃষ্টির প্রতি সমবেদনা এবং বিশেষভাবে এমন এক অনুগ্রহপরায়ণ সরকারের সেবকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা পুণ্যের কাজ এবং **যারা আমাদের প্রাণ ধন-সম্পদ এবং সবচেয়ে অধিক আমাদের ধর্মকে রক্ষা করেছেন। এজন্যে আমাদের জামাতের লোক যেখানে রয়েছে নিজেদের সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী বৃটিশ সরকারের ঐ সব আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্যে যেন চাঁদা দেয় যারা ট্রান্সভাল যুদ্ধে আঘাত পেয়েছে।** সুতরাং এ বিজ্ঞাপন অনুযায়ী আমার জামাতের লোকদের জানানো যাচ্ছে যে, প্রত্যেক শহরের তালিকা পূর্ণ করে এবং চাঁদা আদায় করে ১লা মার্চের পূর্বে মির্যা খোদা বখশ্ সাহেবের নিকট কাদিয়ানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কেননা, এ দায়িত্ব তার ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। যখন তালিকাসহ আপনাদের টাকা এসে যাবে তখন এ চাঁদার তালিকা ঐ রিপোর্টে শামেল করা হবে যার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে। আমাদের জামাত এ কাজকে আবশ্যকীয় মনে করে অতি সত্বর পূর্ণ করুক। ওয়াস্ সালাম।

লেখক-মির্যা গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ ইং

(রোয়েদাদ জলসা দোয়া পুস্তক থেকে। অনূদিত : সাহেবুল কাহ্ফ)

কুরআনী জিন্দেগী

৬। বিশ্বজগতের শাসনকর্তা আল্লাহ্, আকাশ ও পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র তাঁরই, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিক-সর্বশক্তিমান।

কুরআন

১৮। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর শাসন-ক্ষমতা আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান (৩:১৯০)। 'ক'

১৯। তুমি কি অবগত নহ যে, নিশ্চয় আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্রই। এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্য না কোন বন্ধু আছে এবং না কোন সাহায্যকারী (২:১০৮)। 'খ'

২০। আকাশসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে এবং ভূগর্ভস্থ ভিজা মাটির নিচে যা কিছু আছে সবই তাঁর (২০:৭)। 'গ'

২১। এবং যদি আল্লাহ তোমাকে ক্লেশে জড়িয়ে ফেলেন তবে তিনি ছাড়া কেউই তা দূর করতে পারে না, এবং যদি তিনি তোমাকে কল্যাণমন্ডিত করেন তবে তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। 'ঘ'

২২। বস্তুতঃ তিনি তাঁর বান্দাগণের উপর প্রবল এবং তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞাত (৬: ১৮-১৯)। 'ঙ'

২৩। এবং আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৈন্য দলসমূহ আল্লাহ্রই, এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময় (৪৮:৮)। 'চ'

'ক' ২:১০৭; ৩: ২৭-২৮; ৭:১২৯; ১১:৫; ২২:৭; ৫৩: ৬-৭; ৫৭:৩,৬,৭; ৫৯:৭; ৬৫: ১৩; ৬৭:২;

'খ' ৫:১৮,১৯,৪১,১২১; ৭: ১৫৯; ৯:১১৬; ২০:১০৫; ২৩:৮৯-৯০; ২৪:৪৩; ২৫:৩; ২৮:৭১; ৩৫:১৪; ৩৬:৮৪; ৩৮:১১; ৪৫:২৮; ৪৮:১৫; ৯২:১৪;

'গ' ৩:১১০,১৩০,৯৮১; ৪:২৭,১৩২,১৩৩; ৬:১৩,১৪; ১০:৫৬,৬৭,৬৯; ১১:১২৪; ১৪:৩; ২২:৬৫; ২৩:৮৫-৮৬; ৩১:২৭; ৩৪:২; ৪২:৫,৫৪; ৫৩:৩২;

'ঘ' ১০:১০৮; ৩৫:৩; ৩৯:৩৯; ৪৮:১২;

'ঙ' ৬:৬২; ১৩:১৭; ৫৩:৭;

'চ' ৩৩:১০-১১; ৪৮:৫; ৬৭:১১; ৬৮:৫; ৭৪:৩২;

হাদীস

৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দৈনিক একশতবার এ দোয়া পড়লো (যার অর্থ) 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, বাদশাহী একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রসংসাও শুধুমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।' তবে তার দশটি গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব হবে। একশতটি সওয়াব তার নামে লেখা হবে এবং তার একশতটি গুণাহ্ মিটিয়ে দেয়া হবে। ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হতে সুরক্ষিত থাকবে। কোন ব্যক্তি তার থেকে উত্তম সওয়াবের কাজ উপস্থিত করতে সক্ষম হবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি পারবে, যে এর চেয়ে বেশী আমল করল (অধিকবার এ দোয়া পড়ল) (বুখারী-কিতাবু বাদউল খালক)।

১০। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন,

"আল্লাহ্তাআলা কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে তাঁর মুষ্টিতে ধারণ করবেন এবং আসমানকে ডান হাতে জড়াবেন এবং বলতে থাকবেন 'আমিই একমাত্র বাদশাহ' (বুখারী)।

মলফুযাত

৮। "সৃষ্টির সবকিছুর মালিক আল্লাহ্ এবং তিনি তাদের সঙ্গে যেরূপ চান ব্যবহার করেন। তিনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন এবং তিনি যাকে চান ফকির করেন। তিনি যাকে চান অল্প বয়সে মৃত্যু দেন এবং যাকে চান দীর্ঘজীবন দান করেন" (চশমায়ে মা'রেফাত)।

৯। " এই পৃথিবীতে প্রত্যহ আল্লাহ্তাআলার আদেশে এক এক মুহূর্তে কোটি কোটি লোক প্রাণত্যাগ করে, কোটি কোটি শিশু তাঁর ইচ্ছায় জন্ম গ্রহণ করে। কোটি কোটি লোক তাঁর ইচ্ছায় নির্ধন হতে ধনী আবার ধনী হতে নির্ধন হচ্ছে। তবে কেমন করে বলা যেতে পারে যে, এখনও মর্তে আল্লাহ্র বাদশাহাত প্রতিষ্ঠিত হয় নি" (কিশতিয়ে নূহ)?

১০। "আল্লাহ্র শক্তি অনন্ত, কিন্তু মানুষের বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে সে শক্তির বিকাশ হয়। যাঁরা দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রেম লাভ করে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র হয়ে গিয়েছেন এবং স্বার্থপরতার গণ্ডি ও প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করেছেন, তাদের জন্য আল্লাহ্তাআলা তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেন" (কিশতিয়ে নূহ)। (চলবে)

সংকলন ঃ –খোন্দকার আজমল হক

AHMED TRADE INTERNATIONAL
Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.
Dyer : we have a power dyeing house of our own.
with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.
Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211
Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000
Phone :
Off : 239013
Res : 804944
Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

হাকীকাতুল ওহী

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ

(১৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

এখন প্রথমে আমি এই কথা লিখিব যে, তাহার পুস্তক 'আসায়ে মূসা'তে যে সকল ইলহাম লিখিয়াছে ইহাদের সব কয়টিই মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। পরে এই বিষয়ের প্রমাণ দেওয়া হইবে যে, সে আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মরিয়াছে এবং তাহার মৃত্যু আমার সত্যতা সম্পর্কে একটি নিদর্শন; বরং তাহার মৃত্যু আমার সত্যতাকে মোহরাঙ্কিত করিয়া গিয়াছে, আমি এই বর্ণনাকে দুইটি অধ্যায়ে বিভিক্ত করিতেছি।

প্রথম অধ্যায়টি এই বিষয়ের বর্ণনা যে, এলাহী বক্সের ঐ সকল ইলহাম যাহা আমার মোকাবেলায় সে প্রকাশ করিয়াছিল (তাহার সম্পর্কে বা আমার সম্পর্কে), উহাদের সব কয়টিই মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ইহা তো সকলেই অবগত আছে যে, বাবু এলাহী বক্স তাহার নাম মূসা রাখিয়াছিল এবং আমাকে ফেরাউন সাব্যস্ত করিয়াছিল। আমার মোকাবেলায় সে তাহার পুস্তকের নাম রাখিয়াছিল "আসায়ে মূসা"। সে যেন মনে মনে এই কথা ভাবিয়াছিল যে, এই লাঠি দ্বারা সে এই ফেরাউনকে ধ্বংস করিবে। সে একটি চিঠিও আমার নামে পাঠাইয়াছিল। ইহাতে ধমক দেওয়া হইয়াছিল এবং বর্ণনা করা হইয়াছিল যে, খোদা আমাকে জানাইয়াছেন, এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী এবং এই মূসার হাতে তাহার মূলোৎপাটন হইবে। তাহার এইরূপ অনেক মৌখিক ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যেগুলি সে কেবল তাহার বন্ধু-বান্ধব বা সাক্ষাতকারীদের নিকট বলিয়াছিল। সবগুলির সার-সংক্ষেপ ইহাই যে, আমি তাহার জীবদ্দশাতেই ধ্বংস হইয়া যাইব, সে আমার উপর জয়যুক্ত হইবে, আমি তাহার সম্মুখে লাঞ্ছিত হইব এবং পৃথিবীতে সে অনেক উচ্চমানে পৌঁছিবে *।

মূসা নবীর ন্যায় সে লক্ষ লক্ষ লোকের নেতা হইয়া যাইবে। আফসোস, গোপন ইলহামসমূহ জানার জন্য আমি চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ঐগুলি কেবল তাহার বন্ধুদের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল এবং দলিলস্বরূপ কোন লেখা আমি পাই নাই। কিন্তু যে পরিমাণ ইলহাম সে পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছে তাহা এক বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। যদিও কোন কোন নিরর্থক ও নেহায়েত বাজে ইলহাম তাহার যে ছোট একটি নোট বইতে লেখা হইয়া থাকিত তাহা আমি পাই নাই, তথাপি যে পরিমাণ পাওয়া গিয়াছে ঐগুলি তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য যথেষ্ট একটি ভাণ্ডার। যে সকল ইলহাম গোপন করা হইয়াছে ঐগুলি হস্তগত হওয়ার আশা নাই। বরং আমি বিশ্বাস করি ঐ সকল বাজে ইলহাম যাহা সে প্রবৃত্তির উত্তেজনায় আমার সম্পর্কে লিখিয়াছিল, ঐগুলি তাহার সাথেই কবরস্থ করা হইয়া থাকিবে।

ঐ ইলহাম যাহা আমার সম্পর্কে এলাহী বক্স "আসায়ে মূসা"তে লিখিয়াছে উহা সম্পর্কে সে তাহার উল্লেখিত পুস্তকে দাবী করে যে, উহা খোদাতাআলার পক্ষ হইতে। তন্মধ্যে তাহার ঐ কল্পিত ইলহাম আছে যাহা তাহার পুস্তক "আসায়ে মূসা" এর ৭৯ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। তাহা এই যে, "তোমার জন্য শান্তি। তুমি বিজয়ী হইয়া যাইবে। তাহার উপর অর্থাৎ এই অধমের উপর গযব (ক্রোধ) অবতীর্ণ হইবে এবং নিশ্চয়ই ধ্বংস হইয়া যাইবে। অর্থাৎ তুমি জীবিত থাকিয়া তাহার মৃত্যু ও ধ্বংসকে দেখিবে। অতএব চিন্তা করিয়া দেখ। স্বয়ং এলাহী বক্স তাহার পুস্তকের যত্রতত্র এই ইলহামের অর্থের ব্যাখ্যা অন্যান্য ইলহামের মাধ্যমে যাহা করিয়াছে তাহা এই যে, তাহার জীবদ্দশাতেই আমার উপর গযব অবতীর্ণ হইবে এবং আমি ধ্বংস হইয়া যাইব। কিন্তু ইহার বিপরীত সে নিজেই আমার জীবদ্দশায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সকলে অবগত আছে যে, খোদাতাআলার সকল কিতাবে প্লেগের দরুন মৃত্যুকে আল্লাহ্‌র গযব বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। হযরত মূসা আলায়হেস সালামের সময়ে বনী ইসরাঈল জাতির উপর প্লেগের আক্রমণ হইয়াছিল। তাহারা খোদার গযবের পাত্র ছিল। এই প্লেগের বিস্তারিত অবস্থার (বর্ণনা) তাওরাতে বিদ্যমান আছে। ইহা ছাড়া হযরত ঈসার পর ইহুদীদের উপর প্লেগের আক্রমণ হইয়াছিল। তাহাদের উপর ইঞ্জিলে গযব অবতীর্ণ হওয়ার ওয়াদা দেওয়া হইয়াছিল। এই প্লেগের নামই কুরআন শরীফে রিজ্‌জাম মিনাস সামায়ি রাখা হইয়াছে, যেমন আল্লাহতাআলা কুরআন শরীফে বলেন, ফাআনযালনা 'আলাল্লাযীনা যালামূ রিজ্‌জাম্ মিনাস্‌সামায়ি বিমা কানূ ইয়াফসুকূন (সূরা আল্ বাকারা–আয়াত ৬০)। অর্থাৎ আমরা যালেমদের উপর প্লেগের আযাব পাঠাইলাম। কেননা, তাহারা ছিল অবাধ্য পাপাচারী। আল্লাহ্‌তাআলা কোথাও এ কথা বলেন নাই যে, আনযালনা আলায়হিম রিজ্‌জাম্‌মিনাস্‌সামায়ি বিনা কানূ ইয়াফসুকূন অর্থাৎ এই জন্য আমরা তাহাদের উপর প্লেগ অবতীর্ণ করিলাম যে, তাহারা মু'মিন ছিল।

* টীকা : আমার বন্ধু বিজ্ঞ মোকাররম মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেবের লেখা হইতে গযনবী ঘুম অমৃতসরী জামাতের এক বুযুর্গ মৌলবী আবদুল ওয়াহেদের বাবু এলাহী বক্স সম্পর্কে একটি স্বপ্ন জানা গিয়াছে। ইহা আমি আমার ভাষায় না লিখিয়া উল্লেখিত মৌলবী সাহেবের আসল চিরকূট নিম্নে লিখিয়া দিতেছি। তাহা এই যে, আমাদের মহান ইমাম, আলায়কুম সালাওয়াতু ওয়া বরকাতু ওয়াস্ সালাম। আমাকে বন্ধু আবদুল ওয়াহেদ গযনবী চিঠি লিখিয়াছিল যে, আমাদের জামাতের লোকেরা দেখিল এলাহী বক্স একটি উচ্চ মিনারে দণ্ডায়মান এবং মানুষজন তাহার নীচে আছে। এইজন্য এখন তাহার উন্নতি হইবে। আরো অনেক কথা ছিল, যাহা আমার স্মরণ নাই। কেননা, আমি চিঠিপত্র মামুলিভাবে পড়িয়া থাকি। অতঃপর এইগুলি সংরক্ষণ করি না। এলাহী বক্সের মৃত্যুতে আমি আব্দুল ওয়াহেদকে এই বিষয়ে চিঠি লিখিয়াছি। এখানো উত্তর আসে নাই। বিষয়টি নিশ্চিতভাবে আমার যতদূর স্মরণ আছে ইহাই। মহান আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখিয়া আপনার সমীপে আমার নিবেদন শেষ করিলাম। নূরুদ্দীন।

অতএব মু'মিন কোন অবস্থাতেই প্লেগের শাস্তিযোগ্য হইতে পারে না। বরং ইহা কাফের ও অবাধ্য পাপাচারীদের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে। এই কারণেই যখন হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে (তখন হইতে) খোদার কোন নবী প্লেগে মৃত্যুবরণ করেন নাই। হ্যাঁ, এইরূপ মু'মিনও এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মরিয়া যায়, সে পাপ হইতে মুক্ত হয় না। তাহাদের এই মৃত্যু তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়। তাহাদের জন্য ইহা এক ধরনের শাহাদত। কিন্তু কেহ কখনো শুনিয়া থাকিবে না যে, মূসা হওয়ার পর তাহার প্লেগ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ব্যক্তি খবীস, নোংরা ও বজ্জাত হইবে, যাহার এই বিশ্বাস যে, কোন নবী বা আল্লাহ্‌র খলীফা প্লেগে মরিয়াছেন। অতএব যদি ইহা এইরূপ শাহাদত হইত, যাহা প্রশংসাযোগ্য এবং যাহার সম্পর্কে কোন আপত্তি নাই, তবে ইহার প্রথম হকদার হইতেন নবী ও রসূলগণ। আমি এইমাত্র বর্ণনা করিয়াছি যে, যখন হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে কেহ প্রমাণ করিতে পারিবে না কখনো কোন নবী বা রসূল এবং প্রথম সারির কোন সম্মানিত ব্যক্তি, যিনি খোদাতাআলার সহিত কথোপকথন ও সম্বোধনের মর্যাদা লাভ করিতেন, তিনি এই নোংরা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়া গিয়াছেন। বরং আদিকাল হইতে এই রোগের প্রথম হকদার ঐ সকল লোকই ছিল যাহারা বিভিন্ন ধরনের পাপে ও অনাচারে লিপ্ত ছিল বা কাফের ও বেঈমান ছিল। বিবেক কখনো এই কথা সমর্থন করিতে পারে না যে, যে রোগ আদি হইতে খোদা কাফেরদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, ঐ রোগে খোদার নবী ও রক্ষক এবং ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও অংশীদার হইয়া যাইবেন। তওরাত, ইঞ্জিল এবং কুরআন এই তিনটি (ধর্মগ্রন্থ) সর্বসম্মতভাবে একই ভাষায় বর্ণনা করিতেছে যে, প্লেগ সর্বদা কাফেরদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হইয়া আসিতেছে। আদি হইতে খোদা লক্ষ লক্ষ কাফের, অবাধ্য পাপাচারী ও অনাচারীকে এই প্লেগের মাধ্যমেই নাস্তানাবুদ করিয়াছেন, যেভাবে খোদার কেতাবসমূহ ও ইতিহাস হইতে প্রতীয়মান হয়। খোদা ইহার উর্ধ্বে যে, তিনি তাঁহার পবিত্র ব্যক্তিগণকে এই আযাবে কাফেরদের সঙ্গে অংশীদার করিবেন এবং যে বিপদ কাফেরদের আযাবের জন্য আদি হইতে নির্ধারিত রহিয়াছে এবং যাহার মাধ্যমে সর্বদা নবীগণের যুগে হাজার হাজার অবাধ্য পাপাচারী ও অনাচারী মরিয়া আসিতেছে, ঐ বিপদেই তিনি সম্মানিত নবীগণকে আপতিত করিবেন। অতএব যেভাবে খোদার ঐ আযাব লূতের উপর আসিয়াছিল, উহার মাধ্যমে কখনো কোন নবীর মৃত্যু হয় নাই। বরং প্রত্যেক আযাব, যাহা জাতিসমূহের ধ্বংসের জন্য উপস্থিত হইয়াছে কোন নবী এই আযাবে মরে নাই। তদ্রূপেও প্লেগ যাহা কাফেরদের জন্য নির্ধারিত আযাব, তাহা কোন সম্মানিত ব্যক্তির উপর আপতিত হইতে পারিবে না। যদি কেহ ইহার বিপরীত দাবী করে এবং এই কথা বলে যে, অতীতের নবীগণের মধ্যে কোন নবী প্লেগেও ধ্বংস হইয়াছিল, তবে ইহা তাহার ব্যাপার। কোন বল্গাহীন ব্যক্তির বা বেয়াদবের মুখ তো আমরা বন্ধ করিতে পারি না। কিন্তু আল্লাহ্‌র কেতাব হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, প্লেগে.....যাহা সর্বদা কাফেরদের নির্ধারিত। এতদ্‌সত্ত্বেও কোন কোন অপবিত্র মু'মিনকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। এই দুঃখ-কষ্ট দিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করার জন্য দোযখে দেওয়া হইবে। কিন্তু খোদার ওয়াদানুযায়ী, যাহা হইল উলাইকা আনহা মুবআদূন (সূরা আল্ আম্বিয়া-আয়াত ১০২, অর্থ : তাহাদিগকে উহা হইতে দূরে রাখা হইবে-অনুবাদক), সম্মানিত ব্যক্তিগণকে এই দোযখ হইতে দূরে রাখা হইবে। এইভাবে প্লেগও একটি জাহান্নাম। কাফেরকে ইহাতে আযাব দেওয়ার জন্য নিক্ষেপ করা হয় এবং এইরূপ মু'মিন যাহাদিগকে নির্দোষ বলা যায় না এবং যাহারা পাপমুক্ত নহে, তাহাদের জন্য এই প্লেগ পবিত্র করার একটি মাধ্যম। ইহাকে খোদা জাহান্নাম নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। অতএব প্লেগ নগণ্য মু'মেনদের জন্য চিকিৎসাব্যবস্থা হইতে পারে যাহারা পবিত্র হওয়ার মুখাপেক্ষী। কিন্তু ঐ সকল লোক যাহারা খোদার নৈকট্যে ও ভালবাসায় উচ্চ মর্যাদায় অবস্থান করেন, তাহারা কখনো এই জাহান্নামে প্রবেশ করিতে পারেন না। ঐ ব্যক্তি নিজের ইলহাম ইহা পেশ করে যে, তুমি আল্লাহ্‌র পর সবচেয়ে বড়। সার কথা ইহাই মুন্সী আবদুল হকও এই ইলহামের সাক্ষী এবং আরো কয়েক ব্যক্তি সাক্ষী আছে। অবাক লাগে যে, কীভাবে এইরূপ ব্যক্তি, যে খোদার ঐ বুযুর্গ এবং সেই এই যুগের মূসা, সে খোদার ভয়ঙ্কর আযাব প্লেগে ধ্বংস হইয়া যায়! কোন বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কি এই কথা গ্রহণ করিতে পারে?

যদি কেহ বলে বাবু এলাহী বক্‌স প্লেগে মারা যায় নাই তবে আমি ইহার উত্তর এ ছাড়া কি দিব যে, মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। লাহোর হইতে প্রাপ্ত চিঠিতে জানা যায় যে, এলাহী বক্‌স মোহাম্মদ ইসহাকের পুত্র ইয়াকুবের জানাযায় গিয়াছিল এবং ইয়াকুব প্লেগে মরিয়াছিল। সুতরাং ইলাহী বক্‌স ঐ জায়গা হইতেই প্লেগ খরিদ করিয়াছিল। পয়সা পত্রিকা ১০ই এপ্রিলে লেখে, "শোকাবহ মৃত্যু। আফসোস, পেনশনপ্রাপ্ত একাউন্টেন্ট মৌলবী এলাহী বক্‌স সাহেব সোমবার ৮ই এপ্রিলে কেবল একদিন জ্বরে আক্রান্ত থাকিয়া মৌলবী আবদুল হকের গৃহে মৃত্যুবরণ করেন।" ঐ সময়ে লাহোরে কত প্রচণ্ডরূপে প্লেগ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং তাহা এখনো চলিতেছে। যে কোন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এই কথা বুঝিতে পারে যে, হাজার হাজার মানুষ কেবল জ্বরেই মরিয়া গেল? প্লেগ ছাড়া এমন কি জ্বর আছে যাহা একদিনেই মারিয়া ফেলিতে পারে? স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্লেগের জন্য প্রচণ্ড জ্বর হওয়া একটি আবশ্যকীয় ব্যাপার, যাহা দুই এক দিনেই কাজ সাঙ্গ করিয়া দেয়। অতএব সেক্ষেত্রে এলাহী বক্‌সের মৃত্যুর সময় লাহোরের প্লেগ প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করিতেছিল এবং সে-ও প্লেগে মৃতব্যক্তির জানাযা পড়ার জন্য গিয়াছিল ও সেখানেই বেহুঁশ হইয়া গিয়াছিল। এমতাবস্থায় কি কোন জিনের প্রভাবে তাহার অবস্থা হইয়া গিয়াছিল? বলাবাহুল্য, প্লেগের সময় ছিল এবং লাহোরে প্লেগের জোর ছিল প্রচণ্ড। এইজন্য কে অস্বীকার করিতে পারে যে, এই সময়ে শত শত লোক লাহোরে প্লেগের জ্বরে মরিয়াছে ও এখনো অবস্থা তাহাই। কাহারো কাহারো গুটি বাহির হয় এবং কাহারো কাহারো হয় না।

* টীকা : পত্রিকায় এই তারিখটি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। বরং এই ঘটনা ঘটিয়াছিল ৭ তারিখ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায়।

কেহ কেহ নিমোনিয়া প্লেগে মরে। কেহ কেহ বেহুশ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। তাহা হইলে খামাখা বেচারা এলাহী বক্স সম্পর্কে এই মিথ্যা কথা বলা যে, সে প্লেগে মারা যায় নাই, ইহা কতখানি বল্গাহীন কথা। ইয়াকুব কি প্লেগে মারা যায় নাই? আমরা নির্ভরযোগ্য ডাক্তারদের মাধ্যমে জানিয়াছি এলাহী বক্সের ভয়ানক ধরনের প্লেগ হইয়াছিল। ইহা একদিনেই তাহাকে শেষ করিয়া দিল। বস্তুতঃ আমরা এই স্থানে সাক্ষ্যরূপে সহকারী সার্জন ডাক্তার ইয়াকুব বেগ সাহেবের চিঠি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। তাহা এই যে :-

হযরত সৈয়্যদী ও মওলা ওয়া ইমামী হুজ্জতুল্লাহেল মসীহ আল্ মাউওদ সাল্লামাল্লাহুতাআলা। আস্সালামুআলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। হুযূরের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে এবং দুশমন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। হুযূরকে মোবারকবাদ জানাই। প্লেগের সকল লক্ষণ এলাহী বক্সের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে যে, তাহার বাম রানের হাড়ে অর্থাৎ রানের গোড়ায় একটি গুটিও বাহির হইয়াছিল। এইজন্য ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তাহার মৃত্যু প্লেগে হইয়াছে। সবকিছু ভাল আছে।

খাকসার: ইয়াকুব বেগ

লাহোর হইতে

এতদ্‌সত্ত্বেও যদি এই প্রশ্ন ওঠে, এলাহী বক্সের বন্ধুদের মধ্য হইতে, কে এই কথা প্রকাশ করিয়াছে যে, সে প্লেগে মরিয়া গিয়াছে তবে আমরা নিম্নে ১৯০৭ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখের আহ্‌লে হাদীস পত্রিকায় এলাহী বক্সের প্লেগ সম্পর্কে সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই যে :-

আফসোস, "আসায়ে মূসা" এর লেখক মুন্সী এলাহী বক্স সাহেবও প্লেগে শহীদ হইয়া গিয়াছেন। ১৯০৭ সালের ১১ ই এপ্রিলের আহ্‌লে হাদীস পত্রিকা দেখ।

অতঃপর এলাহী বক্স তাহার আরো একটি ইলহাম নিজ পুস্তক "আসায়ে মূসা" এর ৭৯ পৃষ্ঠায় আমার সম্পর্কে লিখিয়াছে। তাহা এই–"ইন্নী মুহিনুন লেমান ইরাদা ইহানাতাকা"। যদিও এই বাক্যটিতে ভুল আছে যে, মান শব্দটির উপর লাম লাগানো হইয়াছে, কিন্তু এলাহী বক্স ইহার এই অর্থ করিয়াছে যেন তাহার মোকাবেলায় আমাকে লাঞ্ছিত করা হইবে এবং তাহার সত্যতা প্রতীয়মান হইবে। প্রকৃতপক্ষে বহুদিন পূর্বে খোদাতাআলা আমার নিকট এই ইলহাম করিয়াছিলেন যে, ইন্নী মুহিনুন মান এরাদা ইহানাতাকা (অর্থ : যে তোমাকে অপমানিত করার ইচ্ছা পোষণ করে আমি তাহাকে লাঞ্ছিত করিব– অনুবাদক)। এলাহী বক্স বহুবার আমার মুখ হইতে এই ইলহাম শুনিয়াছিল এবং খোদা দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, যে-সকল ব্যক্তি আমার মোকাবেলা করিয়াছে তাহাদের পরিণতি কী হইয়াছে। অতএব এই ইলহামে এলাহী বক্স কেবল একটি 'লাম' যোগ করিয়াছে, যাহা সুবিধার জন্য করা হইয়া থাকে। কিন্তু এ স্থলে ইহা প্রযোজ্য নহে এবং ইহার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এমতাবস্থায় এই ইলহামের এই অর্থ দাঁড়ায়, যে এলাহী বক্স, যে তোমার লাঞ্ছনা চায় তাহার সমর্থনে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব। এলাহী বক্সের উদ্দেশ্য অনুযায়ী যদি ইহা মানিয়া নেওয়া হয় যে, তাহাকে লাঞ্ছিত করা হইলে খোদা আমাকে লাঞ্ছিত করিবেন, তবে এক্ষেত্রে এই অর্থও সুস্পষ্টভাবে ভুল প্রমাণিত হইল। কেননা, আমি বৎসরের পর বৎসর প্রকাশ করিতেছি যে, এলাহী বক্স নিজকে মূসা বানানোয় ও আমাকে প্রত্যাখ্যান করায় সে মিথ্যাবাদী। খোদা তাহাকে লাঞ্ছিত করিবেন। দীর্ঘদিন হইল আমি আমার এই ইলহাম প্রকাশ করিয়াছি। এই অবস্থায় ইহা সুস্পষ্ট যে, খোদা আমার সম্মুখে এলাহী বক্সকে প্লেগে মৃত্যু দিয়া লাঞ্ছিত করিয়াছেন এবং তাহার সকল দাবীতে সে ব্যর্থ রহিল। পক্ষান্তরে খোদা লক্ষ লক্ষ মানুষকে আমার জামাতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া আমাকে সম্মান দিলেন। অতএব যদি এলাহী বক্সের নিকট এই ইলহাম খোদাতাআলার পক্ষ হইতে হইয়া থাকিত যে, যে ব্যক্তি তোমাকে লাঞ্ছিত করে আমি তাহাকে লাঞ্ছিত করিব তবে ঐ ইলহাম পূর্ণ হইয়া যাওয়া জরুরী ছিল। অথচ এলাহী বক্সের অসময়ের মৃত্যু, যাহা আমার জীবদ্দশাতেই হইল, উহা তাহার মিথ্যাবাদী হওয়ার উপর মোহর লাগাইয়া গিয়াছে। সে দাবী করিত এই ব্যক্তি ফেরাউন, আমি মূসা, আমার জীবদ্দশাতেই এই ব্যক্তি ধ্বংস হইবে এবং প্লেগে মরিবে; তাহার পুরা সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহার উপর খোদার গযব অবতীর্ণ হইবে এবং তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। কিন্তু ইহার বিপরীতে খোদা আমাকে পরিপূর্ণ উন্নতি ও পরিপূর্ণ সম্মান দিলেন। তিনি পৃথিবীর চতুর্দিকে আমাকে পরিপূর্ণ খ্যাতি দিলেন এবং আমার জীবদ্দশাতে এই বাজে, বেয়াদব, গরম মেজাযী ও দুর্মুখ দুশমনকে প্লেগে ধ্বংস করিবে। অতএব এখনো কি তাহার নাম মূসা রাখিবে? যাহাকে সে ফেরাউন বলিত এবং নিজের জীবদ্দশাতে তাহার ধ্বংসের খবর দিত, তাহার সম্মুখে প্লেগের লাঞ্ছিত মৃত্যু দ্বারা সে ধ্বংস হইয়া গেল। ইহা কীরূপ মূসা ছিল? ইহা অদ্ভুত ব্যাপার যে, যে ব্যক্তিকে সে ফেরাউন সাব্যস্ত করিত সে তাহার এই ইলহাম প্রকাশ করিয়াছিল, ইন্নী উহাফিযু কুল্লামান ফিদ্দার অর্থাৎ খোদা বলেন, যেসকল ব্যক্তি এই গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে আছে তাহাদের সকলকে আমি প্লেগ হইতে রক্ষা করিব। ১১ (এগার) বৎসর যাবৎ এই অঞ্চলে প্লেগের বড় বড় আক্রমণ হইতেছে। কিন্তু খোদাতাআলার ফযলে আমার গৃহের একটি কুকুরও প্লেগে মারা যায় নাই। কিন্তু যে নিজেকে মূসা সাব্যস্ত করিত সে নিজেই প্লেগে মরিয়া গেল। কেবল ইহাই নহে। বরং তাহার সকল ইলহাম মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল এবং তাহার লাঞ্ছনার কারণ হইল, যাহা সে আমার মৃত্যু, প্লেগ ও ব্যর্থতা সম্পর্কে প্রকাশ করিয়াছিল। অতএব তাহার এই ইলহাম 'ইন্নী মুহীনুন লেমান ইরাদা ইহানাতাকা' কোথায় গেল? এই পরিণতি ঐ সকল লোকের হইয়া থাকে, যাহারা স্বগতোক্তির নাম ইলহাম রাখে এবং খোদার কর্মের সাক্ষ্য দ্বারা নিজেদের ইলহামসমূহকে পরীক্ষা করে না। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

জুমুআর খুতবা

ওয়াকফে জাদীদ ও নবাগতদের তরবীয়ত

"হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ওয়াকফে জাদীদের নব বর্ষের ঘোষণা প্রদান করেছেন।"

সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা, ২রা জানুয়ারী, ১৯৯৮ ইং মসজিদে ফযল, লন্ডন।

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আইঃ) সূরা হাদীদ-এর ৬-৮ নং আয়াত পাঠ করে খুতবা এরশাদ করেন। হযরত আকদস (আইঃ) বলেন; আজ আল্লাহ্‌র ফযলে ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করা হবে। অতীতেও সাধারণতঃ জানুয়ারী মাসের প্রথম জুমুআয় ওয়াক্‌ফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা হয়ে আসছে।

নববর্ষের এই ঘোষণার পূর্বে আমি একটি কথা বলতে চাচ্ছি। আমি যখন জুমুআর জন্য আসছিলাম পথিমধ্যে "সাল্লে'আলা নাবীয়েনা –" মধুর শব্দ আমার কানে আসছিল, যা M.T.A-এর মাধ্যমে প্রচার হচ্ছিল। এই স্বর শুনে আমার হৃদয় আল্লাহ্‌র প্রশংসায় ভরে গেল। পাকিস্তানের মোল্লারা রাবওয়াতে আমাদের শিশু-কিশোরদের এমন "সাল্লে 'আলা নাবীয়েনা .....সাল্লে 'আলা মুহাম্মাদীন" পড়তে দেয়নি। যারা পড়ছিল তাদের কয়েদ করা হয়েছিল, – বলা হয়েছিল তারা যেন এমন করে 'সাল্লে'আলা নাবীয়েনা সাল্লে 'আলা মুহাম্মদীন' না পড়ে।

আজ সারা বিশ্বে M.T.A -এর মাধ্যমে 'সাল্লে 'আলা নাবীয়েনা' ধ্বনিত হচ্ছে। কারো ক্ষমতা নেই যে, বাধা দেয় এতে। ইহা আল্লাহ্‌র একটি বড় অনুগ্রহ, আমাদের ইহা স্মরণ রাখা উচিত। আল্লাহ্ যেন, তাদের দ্বারা সৃষ্ট সকল বাধা দূর করে দেন। তাদের সমস্ত বাধা দূর হয়ে যাবে; আকাশ থেকে সীমাহীন আল্লাহ্‌র কৃপা অবতীর্ণ হতে থাকবে। তারা আক্ষেপের সাথে দেখতে থাকবে। এই সত্যও যদি তারা অনুভব করতে না পারে তবে তারা আর কি অনুভব করছে? তারা নিজেরা নিজ চোখে দেখছে যে, আমাদের উপর আল্লাহ্‌র অশেষ করুণারাশি অবতীর্ণ হচ্ছে – আর চিৎকার করছে যে, তারা মুবাহালা জিতে গিয়েছে। তোমরা 'ঘোড়ার ডিম' জিতেছ। আমি ঐ কাহিনী পরে কোন সময় বলব যে, তারা কি চিনেছে আর কি জিতেছে? এখানে শুধু এতটুকু বলছি যে, **আপনারা অনেক বেশী বেশী আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন না কেন তা কখনও যথেষ্ট হবে না, এতবড় তাঁর কৃপা!**

আর একটি কথা যা আমি কথা প্রসংগে উল্লেখ করতে চাচ্ছি, তা হযরত মির্যা মনসূর আহমদ সাহেবের মৃত্যু সম্পর্কে। আপনাদের শোক-বার্তা, পত্র, ফ্যাক্স এবং এখানে উপস্থিত হয়ে আমার সাথে দেখা করে শোক প্রকাশ করা .....ইত্যাদি। আসল ঘটনা এই যে, আপনাদের সকল পত্র আমাকে নিজে পড়তে হয়। প্রতিদিন এত বেশী চিঠি-পত্র হয়ে যায় যে, রমযানের অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে আমার জন্য প্রতিদিন এতগুলো পত্র পড়া সম্ভব হচ্ছে না। আপনারা যারা নিজ নিজ অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন, তাদেরকে ভাল করে চিনি এবং জানি – কে কোথায় কোন পর্যায়ের তা-ও জানি। ঘটনা এই যে, আমি খুৎবায় হযরত মির্যা মনসূর আহমদ সাহেবের আধ্যাত্মিক উন্নত মার্গ সম্পর্কে বলেছিলাম – ঐ খুতবা শোনার পর অধিকাংশ পত্রে এই কথা বলা হচ্ছে যে, আমরা প্রথমবার জানতে পারলাম। কথা হচ্ছে এই যে, আপনারা সকলেই দোয়া করছেন এ কথা আমি জানি। আপনাদের এ সমস্ত পত্রের উত্তর দেয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। অতএব, আপনাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি – যারা পত্র লিখেছেন বা এখানে এসে সমবেদনা ও শোক প্রকাশ করেছেন আমার বিনীত আবেদন, আপনারা ধরে নিন যে, আমি আপনাদিগকে চিনি, জানি, দোয়া করি, – ছোট-বড় মহিলা-পুরুষ- সকলকে আল্লাহ্ উত্তম পুরস্কার দান করুন। এ বিষয়ে আর লিখবেন না। হ্যাঁ, বিশেষ কোন কথা যদি উল্লেখ করতে চান তা নির্দ্বিধায় লিখতে পারেন, এতে কোন বাধা নেই।

অনুরূপভাবে নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন সম্পর্কেও ঐ একই অবস্থা। এত বেশী ফ্যাক্স ও পত্র এসেছে যে, প্রত্যেককে উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। অতএব, যারা নববর্ষের শুভেচ্ছা-বার্তা পাঠিয়েছেন তাদেরকেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ বিষয়ে এখানেই ইতি টানুন। **মূলত: ইহা একটি নিছক প্রচলিত প্রথা বৈ অন্য কোন গুরুত্ব নেই** এর মাঝে। তাছাড়া নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে বা মোবারকবাদ জানাবার জন্য অতি সাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করাই আমরা পসন্দ করি। বেশী কিছু বা অতি আড়ম্বরপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন পড়ে না। নববর্ষের শুরুতে আপনারা আমার জন্য দোয়া করুন। আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি। সবাই জামাতের জন্য দোয়া করুন। এভাবে নববর্ষের সুন্দর সূচনা হবে।

এবার আমি ওয়াক্‌ফে জাদীদের নববর্ষের খুতবার আরম্ভে যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি যে সম্পর্কে বলছি।

"লাহুমুলকুস সামাওয়াতে ওয়াল আরয, ওয়াইলাল্লাহে তুরজাউল উমুর।" ইহা একটি সাধারণ ঘোষণা যে, আকাশ এবং ভূমণ্ডলের উপর কেবল আল্লাহ্‌রই একমাত্র রাজত্ব। এই রাজত্বে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো অংশীদারিত্ব নেই। মানস-পটে এই সত্যতার প্রতিষ্ঠার নামই তৌহীদ। "ওয়া ইলাল্লাহে তুরজাউল উমুর।" শুধু তাঁর রাজকীয় ক্ষমতায় নয় বরং এই রাজ্যের সমস্ত বিষয়ের পরিসমাপ্তি তাঁরই হাতে ঘটবে। সব কিছুই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব, তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে আসার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ্‌র রাজত্ব পার্থিব রাজাদের রাজত্বের অনুরূপ নয় যে, এক রাজ্যের সীমানা থেকে পালিয়ে অন্য রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া যাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাজ্যে ভূপৃষ্ঠে এবং আকাশে কোথাও পালিয়ে যাওয়ার

জায়গা নেই। আর যদি থাকত তবুও তাঁর নিকট ফিরে যেতেই হবে। পৃথিবীতে অনেক সময় আল্লাহ্‌র তকদীরের বহিঃ প্রকাশ ঘটতে অনেক দেরী হয়ে যায়। আঁ হযরত (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। দেখ! তোমার বিরুদ্ধবাদীদের শাস্তি যদি ইহকালে না হয় – নিশ্চয়ই তুমি জান যে, অবশেষে শাস্তি অবশ্যই হবে। আঁ হযরত (সাঃ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্‌তাআলার এই নির্দেশ প্রকৃতপক্ষে বড় গভীর হেকমতপূর্ণ। আঁ হযরত (আঃ)-এর মনে পূর্ণ প্রশান্তি ও তৃপ্তি ছিল, কোন আক্ষেপ ছিল না।

কেননা, তিনি পরকালের উপর বিশ্বাস রাখতেন। হুযূর (সাঃ)-এর নিকট এটা কোন বিষয় নয় যে, বিরোধীদের শাস্তি ইহকালে হোক বা পরকালে হোক। গভীরভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, হুযুর (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে ইহকাল ও পরকালের বড় কোন পার্থক্য নেই। যদি পরকালের উপর সঠিকভাবে বিশ্বাস থাকে তবে বিরোধীদের হুমকী বা অপচেষ্টা কোন অর্থ বহন করে না। আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, "ওয়া ইলাল্লাহে তুরজাউল উমুল –" অবশেষে সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে। এতে আবার বিচলিত হওয়ার কী আছে! আল্লাহ্‌র উপর এই প্রকারের পূর্ণ বিশ্বাস জামাতের নিকট থেকে আমি আশা করছি। আর আমি স্বয়ং চেষ্টা চালাচ্ছি যেন এমন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখেই মরতে পারি। আল্লাহ্ সম্পর্কে অন্তরে এক সর্ষে পরিমাণ অভিযোগ যেন না থাকে। অসুখ-বিসুখ হোক আর শত্রুর হুমকি হোক – বা শত্রুর আস্‌ফালন হোক, জীবনের অন্য কোন সমস্যাই হোক সকল অবস্থায় যদি আপনার ধর্ম এরূপ হয় তাহলে হামেশা আপনি প্রশান্তিতে থাকতে পারবেন। মৃত্যুর সময়ও আপনি শান্তির সাথে মৃত্যুবরণ করতে পারবেন। যা অন্যের ভাগ্যে জোটে না। এই প্রংসগে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন – ইউলেজুল লায়লা ফিন্‌নাহারে –ইউলেজুন্ নাহারা ফিল্ লায়লে –" তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান। এখানে দিনকে রাতে প্রবেশ করানোর মধ্যে একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে, – ইউলেজুন নাহারা ফিল্ লায়লে – এখানে এমনই এক দিনের প্রতি ইংগিত বহন করছে যা, মু'মিনদের জন্য আসে আর ফিরে যায় না। সাধারণতঃ কুরআন শরীফে ভাল সম্বোধন প্রথমে করা হয় আর কষ্টের কথা বা অশুভ কথা পরে ব্যক্ত করা হয়। আর যেখানে এই ধারাবাহিকতা বদলে দেওয়া হয় সেখানে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা থাকে। এই আয়াতে রাতের মধ্যে মু'মিনদের দিন প্রবেশ করবে বলা হয়েছে। আর তাদের জন্য যখন দিন হবে তখন এই দিন আর রাতে প্রবেশ করবে না। আমি আশা করছি আপনারা বিষয়টিকে ভালভাবেই বুঝে নিবেন। তারপর সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র হাতে – সমস্ত ভরসা আল্লাহ্‌র উপর কোন বিতর্ক বাকী থাকে না। ইহা এমনই এক তক্‌দীরে এলাহী যা কখনও পরিবর্তন হয় না। দেরী হতে পারে – কিন্তু অন্ধকার হতে পারে না। আল্লাহ্‌র দিকে বড় দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে থাকে। যখন একবার ঐ দিনের উদয় হয় তখন আর কোন অন্ধকার ইহার পথ রোধ করতে পারে না।

"আমেনূ বিল্লাহে ওয়া হুয়া আলীমুবিযাতিস্ সুদূর –" তিনি হৃদয়ের অবস্থাকে ভাল করে জানেন। যারা আল্লাহ্‌র উপর এমন ভরসা রাখেন না যা এই আয়াতে বলা হয়েছে – তারা জেনে রাখুন যে, – আল্লাহ্ অন্তরের অবস্থাকে ভাল করে জানেন। আর যাদের অন্তরে এই কথা আছে তাদের এই কথাকে ঢোল পিটিয়ে প্রকাশ করার প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ্ হৃদয়ের অবস্থা জানেন – তিনি তাঁর ওপরে নির্ভরশীলদের সাথে এমনই ব্যবহার করেন যেমন ব্যবহার করা তাঁর নিয়ম। "আমেনূ বিল্লাহে ওয়া রসূলিহী ওয়া আন্‌ফেকূ –" আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখ তাঁর রসূলের উপর বিশ্বাস রাখ আর তিনি তোমাদের জন্য যা দিয়েছেন তা থেকে খরচ কর। যা কিছু ধন-সম্পদ বা অন্য শক্তি সামর্থ্য যা-ই তিনি দিয়েছেন – তা থেকে খরচ কর। – 'এসতেখলাফ' – বা উত্তরাধিকারী হওয়ার বিষয়টি পূর্ববর্তী জাতীয় উত্তরাধিকারী হওয়ার সাথে সম্পর্কীত। যা পূর্ববর্তী জাতিকে দেওয়া হয়েছিল তা নিশ্চয় তোমাদিগকে দেওয়া হবে। তোমরা উহার উপর অধিষ্ঠিত হও। আল্লাহ্ তোমাদের নিকট আশা করেন না যে, তোমরা উত্তরাধিকার সূত্রে যা পাও তা বিনষ্ট কর। যেদিন তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা যেন রাতে পরিবর্তীত হয়ে না যায়। যদি এমন হয় তবে তোমরা এর জন্য দায়ী হবে।

"আল্লাযীনা আমানূ মিনকুম ওয়া আনফিকূ" স্মরণ কর যে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং খরচ করে। সকল প্রকার শক্তি-সামর্থ্য, ধন-সম্পদ, প্রাণ, আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে তাদের জন্য "আজ্‌রুন কাবীর –" অনেক বড় পুরস্কার অবধারিত আছে।

রমযানের বরকতময় মাস, ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণার জন্য এই বিষয়টি আরম্ভ করেছিলাম – রমযানের সাথে বিষয়টিকে মিলিয়ে দিতে চাচ্ছি যেন রমযানের বরকতের সাথে ওয়াকফে জাদীদের এবং ওয়াকফে জাদীদের সাথে রমযানের বরকত শামেল হয়ে যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে আছে" – হুযূর (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক সকালে দু'জন ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হন। একজন বলেন, হে আল্লাহ্! তোমার রাস্তায় যে ব্যক্তি দান করে তাকে তুমি আরো দাও এবং তার পদাঙ্কানুসরণকারী এমন ব্যক্তি আরো সৃষ্টি করো। অপর ফিরিশ্‌তা বলেন; হে আল্লাহ্! কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস কর এবং তার ধন-সম্পদ ধ্বংস কর" (বুখারী কিতাবুয্ যাকাত)।

হাদীসের প্রথম অংশতো বড় সুস্পষ্ট। যারা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, বিশেষ করে রমযান মাসে তাদের জন্য ফিরিশ্‌তারা দোয়া করেন। যারা তাদের পথ অনুসরণ করে তাদের জন্যও দোয়া করেন। অতএব, আপনারা পুণ্যের কাজে সন্তানদেরও অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনার আশে-পাশে যারা থাকেন তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করুন। যেন পুণ্যের বিষয়টি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও ফলপ্রসূ হয়– সারা পৃথিবীতে যেন প্রসার লাভ করে। ইহা এমন একটি কাজ যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরিচালিত বা তাদের অনুকূলে হবে। ফিরিশ্‌তারা দোয়া করবেন আর আপনারা সামনে অগ্রসর হতে থাকবেন। যারা আর্থিক কুরবানী করে আল্লাহ্‌তাআলা দ্রুত তাদেরকে কল্যাণমন্ডিত করেন। এই কল্যাণের নমুনা আমরা দেখছি। সারা পৃথিবীতে এমন কুরবানী যারা করেন তাদের ধন-সম্পদ আরো বৃদ্ধি হচ্ছে। তারা তাদের মতো আরও কুরবানীকারী মানুষ সৃষ্টি করছেন। যার ফলে আহমদীয়া জামা'ত ক্রমান্বয়ে আর্থিক প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হচ্ছে। আমি এর পূর্বেও অনেকবার বলেছি যে, এমন কোন প্রয়োজন সামনে আসেনি, যা ন্যায্য প্রয়োজন ছিল আর তার পক্ষে ঐশী সাহায্য আসেনি। বরং প্রতিনিয়ত ঠিক প্রয়োজনের সময়ে দেখা যায় যে, প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা বিনা আহ্বানেই হয়ে গেছে। আমাদের এখানে অর্থ দফতরে মোবারক জাফর সাহেব আছেন আশরাফ সাহেবের সহকারী হিসাবে,

যখনই জাফর সাহেব বিশেষ প্রয়োজনের সময় আমার দফতরে আসেন তার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দেখে আমি বুঝতে পারি যে, আবার ঐ একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। জাফর সাহেব হাসি রাখতে পারেন না যে, পুনরায় ঐ ঘটনা ঘটেছে। তিনি আমার নিকট জানতে এসেছিলেন যে, অমুক কাজে বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে – কোথা থেকে এটা মেটানো হবে। কিন্তু ইতোমধ্যেই ঐ প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা-পত্রও হাতে এসে গেছে। এটা এমন একটা বিষয় যে, বরাবর এমন ঘটে আসছে – কোনদিন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সুতরাং আপনারা একটি নিরাপদ হাতে হাত রেখেছেন। শুধু তাই নয় যে, আপনারা নিরাপদ হাতে আছেন বরং আপনাদের অন্তরের সততার জন্যও এটি একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের সাথে। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লোক দেখানো নয় – যারা আল্লাহ্‌র পথে নিজ ধন-সম্পদ খরচ করে, তাদের সাথে এমন প্রতিশ্রুতি। আমাদের সাথেও এই প্রতিশ্রুতি। সবচেয়ে বড় খুশীর বিষয় এই যে, আল্লাহ্‌তাআলা এদের অন্তরের অবস্থার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করেছেন। এদের অন্তরের সততাকে গ্রহণ করেছেন। কবুল করেছেন। ইহা গ্রহণীয় হবার নিদর্শন যা আমরা দেখেছি। আল্লাহ্ করুন অনাদিকাল পর্যন্ত যেন আমাদের কুরবানী কবুল হতে থাকে।

যারা ধন-সম্পদ খরচ না করে জমা করে রাখে তাদের ধ্বংসের দোয়া (হাদীসে বর্ণিত) সম্পর্কে বলছি। অনেক সময় দেখা যায় যে, যারা কৃপণ–খরচ করে না – তাদের ধ্বংস হয় না – কেন ধ্বংস করা হয় না? এই বিষয়ে পূর্বেও বলেছি – যদি আল্লাহ্‌তাআলা মু'মিন বান্দাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করেন তাদের কোন ভাল কর্মের ফলে অথবা নিজ কৃপায় তাদের রক্ষা করেন। অথচ সে আল্লাহ্‌তাআলার পথে খরচের ব্যাপারে কৃপণতা করে – এমন ব্যক্তিদের সম্পদ ধ্বংস হতে আরম্ভ করে। যেন সে হোঁচট খেয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে। অনেক সময় এমন ব্যক্তিরা শিক্ষা লাভ করে থাকেন– তারা আমাকে লিখেন যে, এখন তারা বুঝতে পেরেছেন, পূর্বে ভুল করেছিলেন। এখন যখন আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা আরম্ভ করেছেন – আল্লাহ্‌র রহমতে আর্থিক উন্নতি হতে আরম্ভ করেছে। অপর পক্ষে আল্লাহ্ যাদেরকে নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে করে নিয়েছেন; শুকনো কাষ্ঠ মনে করেছেন, তাদেরকে পৃথক করে রেখেছেন। তাদের সম্পদ অনেক সময় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে দেখা যায় শীঘ্রই ধ্বংস হতে দেখা যায় না। কিন্তু জামাতে আহমদীয়া এই সমস্ত লোকদের ভ্রুক্ষেপ করে না। তারা তাদের সম্পদ নিয়ে যা খুশী করেন, যেখানে খুশী যান, জামাতের পরিমাণও অভাব হয় না। তাদের স্থলে আল্লাহ্ আরো এমন ব্যক্তি সৃষ্টি করেন যারা কুরবানীর ময়দানে নেমে আসেন। আমাদের সাথে আল্লাহ্‌র এই সদ্ব্যবহার আদিকাল থেকে হয়ে আসছে। উল্লিখিত হাদীসে এই বিষয়কে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত ইবনে মাসুদ বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, "দুই ব্যক্তি ছাড়া কারো সাথে প্রতিযোগিতা করা উচিত নয়। একজন এমন লোক যাকে আল্লাহ্‌তাআলা ধন-দৌলত দিয়েছেন। আর সে আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী করে দিয়েছেন। যদিও এমন ব্যক্তিরা নিজেকে গোপন রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অনেক সময় তিনি প্রকাশ পেয়েও যান। যেন অন্যেরা শিক্ষা লাভ করতে পারে। যখন এমন ব্যক্তিকে দেখ! তখন তার দিকে লোভাতুর দৃষ্টি দাও। দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন, যে বড় জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় এবং তিনি নিজ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা মানুষের সমস্যার মীমাংসা করে থাকেন। এবং মানুষকে শিক্ষা দান করেন। সুতরাং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সবার জন্য ব্যয় করা উচিত। ইহাও এমন খরচ বা ব্যয় যদ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। এটাও এমনই যেমন অর্থ-সম্পদ খরচ করলে বৃদ্ধি পায়। আপনি যতই জ্ঞান লাভ করেন এবং অন্যের মধ্যে বিতরণ করেন – আল্লাহ্ এই খরচকে কমতে দেন না।

আমি ইতিপূর্বে বলেছিলাম যে, অনেকে চিকিৎসার বিশেষ কিছু প্রেসক্রিপশান গোপন করে রাখে – প্রকাশ করতে চান না। শুধু পূর্বাঞ্চলেই নয় বরং পশ্চিমা দেশসমূহের বড় বড় কোম্পানী আছে নিজেদের প্রযুক্তি বা পদ্ধতি অন্যদের কাছে প্রকাশ করে না যেন শুধু তাদের প্রস্তুত করা দ্রব্যই প্রসিদ্ধি লাভ করে। নিজেদের প্রযুক্তিকে এমনভাবে গোপন করে রাখে যে, অন্যেদের জন্য সুযোগই থাকে না তা উদ্‌ঘাটন করার। অথচ তারা যদি এমন না করতো তবে আল্লাহ্ তাদের আরো উত্তম-পদ্ধতি উদ্ভাবন করার যোগ্যতা দান করতেন। কিন্তু এদিকে তাদের দৃষ্টি যায় না। আমাদের দেশেও এমন লোক আছে –যারা প্রেসক্রিপশান গোপন রাখে। আমার নিকট এমন পত্র আসে যে, এই প্রেসক্রিপশান কেবল মাত্র আপনাকে জানাচ্ছি। গত ২০/৩০ বছর যাবৎ ইহা আমি কাউকে জানাই নি বা জানতে দেননি। আজ আমি আপনার হাতে এই গোপন প্রেসক্রিপশান তুলে দিলাম। আপনিও সতর্কতার সাথে ব্যবহার করুন কাউকে জানাবেন না। যেন কেউ কোন মতেই এটা জানতে না পারে। এমন প্রেসক্রিপশানকে আমি প্রত্যাখ্যান করে থাকি। আল্লাহ্ আমাকে বড় ভাল ভাল ব্যবস্থাপত্র বা প্রেসক্রিপশান শিখিয়েছেন, আমি সারা পৃথিবীর মানুষকে জানাচ্ছি। বিন্দু মাত্র কৃপণতা নেই। এতে করে আমার জ্ঞান কম হচ্ছে না, বরং বাড়ছে। আল্লাহ্‌র এমন বান্দারা আছেন যারা আমাকে লিখেন যে, আমার জানা মতে এই ব্যবস্থাপত্র আছে – আপনি ইচ্ছে করলে সবাইকে জানাতে পারেন। আমার কোন আপত্তি থাকবে না – এই তো আল্লাহ্‌র বান্দার সম্পদ। আমার তো এমন আহমদীই দরকার। এমন ব্যক্তিদের উক্ত বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায় যে, তোমরা তোমাদের জ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রজ্ঞা, যথারীতি সকলের জন্যে ব্যয় কর – কোন বাধা নাই – কমও হবে না।

"মান যাল্লাযি ইউকরিযুল্লাহা কারযান হাসানা" – (কে এমন আছে, যে আল্লাহ্‌কে নিজ ধন-সম্পদ থেকে উত্তম ঋণ দিবে)। আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কিছু উদ্বৃতি এনেছি এবং তা শোনাচ্ছি। আপনারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা সম্পর্কে মসীহ মাওউদ (আঃ) কি বলেছেন শুনুন – (আল্ হাকাম থেকে)।

[আমার ব্যক্তিগত কিছু কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। এতো চিরাচরিত প্রথা: পূর্বেও এমন হতো – আমি ইহা পৈত্রিক সূত্রে পিতা ও বড় থেকে পেয়েছি কিন্তু এতে ক্ষতির কিছু নেই। ইতোপূর্বে আমি রং চা বা গরম পানির মাধ্যমে ঠোঁটকে ভিজিয়ে নিতাম কিন্তু এখন রোযার কারণে সম্ভব নয়। আমি যেভাবে প্রজ্ঞার কথা বলছিলাম এমনই যেন বলতে পারি – আল্লাহ্ তৌফীক দান করুন। আমার থেকে এমন প্রজ্ঞার কথা শুনতে আপনাদের কষ্ট না হয়। আমার মুখ শুকে যাচ্ছে (তাই আপনাদের কষ্ট হচ্ছে) কিন্তু যা বলছি –তা বড় রসালো – এত ভাল কথা যে, এতে কোন শুষ্কতা দেখবেন না। দোয়া করুন, আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে তৌফীক দান করুন যেন আমি রমযান

মাসের সমস্ত দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করতে পারি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন – "আল্লাহ্‌তাআলা যে ঋণ চান, এর অর্থ এই নয় যে, (মা'যাল্লাহ্‌) আল্লাহ্‌ অভাবগ্রস্থ বা তাঁর কোন প্রয়োজন আছে। এমন কল্পনা করাও কুফরী হবে। এবং এর অর্থ এই যে, তিনি পুরস্কারসহ ঐ টাকা ফেরত দিবেন। এটি একটি পদ্ধতি। আল্লাহ্‌ যার প্রতি কৃপা করেন তার জন্য এই পদ্ধতি রেখেছেন। অর্থাৎ তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন – এমন পরীক্ষা যা তোমাদের জন্য বড় মঙ্গলজনক হয়। **তোমরা নিজ অর্থ-সম্পদকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ব্যয় করে নষ্ট করে থাক। কখনও লাভ হয় কিন্তু অধিকাংশ সময় নষ্ট হয়। বিশেষ করে যারা সুদ খায় তারা তো অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু সাধারণ ব্যবসায়ীরা অনেক সময় লাভ করেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ তোমাদের একটি ভাল ব্যবস্থা দান করেছেন যে, তোমরা তাকে ঋণস্বরূপ অর্থ দাও। এই ঋণ অবশ্যই উত্তম ঋণ হতে হবে। উত্তম অর্থ এই ঋণের সাথে কোন শর্তযুক্ত থাকবে না যখন আল্লাহ্‌কে এমন ঋণ দাও তখন এ জন্য দাও যে, আমি স্বেচ্ছায় আনন্দের সাথে তোমাকে দিচ্ছি – হে আল্লাহ তুমি কবুল কর।**

আমরা চাই যে, আমাদের সম্পদ থেকে কিছু অংশ যেন তোমার সমীপে পেশ করি – এতে আমাদের বড় খুশী ও তৃপ্তি হবে – যদি তুমি গ্রহণ কর। এই আগ্রহ নিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় উত্তম ঋণ দেয়া হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌ তখন আপনাদের আন্তরিকতা অনুযায়ী ঐ কুরবানীর ফল দান করেন। আপনার হৃদয়ের সততা ও নিষ্ঠা যে মার্গের হবে তদনুযায়ী তিনি আপনাদের কল্যাণ দান করবেন। যাদের স্বল্প ব্যয় অনেক বেশী কল্যাণমণ্ডিত হয়। তা তাদের হৃদয়ের সততার কারণে অন্যদের অধিক অর্থ ও তত বেশী কল্যাণ বয়ে আনে না। ইহা তাদের সততার অভাবেরও ইংগিত বহন করে। আল্লাহ্‌ অবশ্যই প্রত্যেকের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং প্রত্যেককে তাদের অর্থ বৃদ্ধি করে দেন যে পরিমাণ তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বৃদ্ধি হওয়ার বহু উদাহরণ আছে যে, এমন করে বাড়িয়ে দেন অমন করে বাড়িয়ে দেন, কিন্তু শেষে একথায় বলেন – যার জন্য চান তিনি আরো বেশী বৃদ্ধি করেন। কতটা বাড়ান তার কোন পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। **এতবেশী বাড়াতে সক্ষম যা আপনারা হিসাব করতে পারবেন না। যতবেশী তিনি বাড়ান ততবেশী কুরবানী করার আগ্রহও বৃদ্ধি হতে থাকে।** যদি এত বেশী বৃদ্ধি হয় যার পর কুরবানীর আগ্রহ কমতে আরম্ভ করে তবে ইহা বড় মন্দ পরীক্ষা। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদিগকে যেন এমন মন্দ পরীক্ষায় না ফেলেন (আল্‌ হাকাম, ৬ষ্ঠ খন্ড নং ১৭ই মে, ১৯০৩ ইং)।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, একজন অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করে, "মান যাল্লাযী ইউকরেযুল্লাহ..... কে আছে যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান করে....." এর অর্থ আল্লাহ অভাবগ্রস্থ, অভুক্ত। অনেকে মনে করে, বিশেষ করে ইসলামের শত্রু, অনেক অজ্ঞ মুসলমানও আপত্তি তুলেন, দেখ! কি ধরনের কথা। আল্লাহ্‌ কি অভুক্ত যে তার ঋণ গ্রহণ প্রয়োজন? হুযূর (আঃ) বলেছেন, অবুঝ বুঝে না যে, এখানে আল্লাহর্‌ অভুক্ত হওয়া কি করে প্রমাণিত হচ্ছে– এখানে ঋণের অর্থ এই যে, যা কিছু ফেরত দেয়ার অঙ্গীকার থাকে তার সাথে সততা নিজ থেকে শামেল করতে হয় – এখানে ঋণের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, " কে এমন আছে যে আল্লাহ্‌র নিকটে সততা ও সৎকর্ম পেশ করবে। আল্লাহ্‌তাআলা তার অনেক বেশী প্রতিফল পেশ করবেন (আল্‌ হাকাম, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২১, ১৯০১ইং)।

এখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সৎকর্ম সম্পর্কে অসাধারণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হুযূর (আঃ) বলেছেন; করযে হাসানা বা উত্তম ঋণকে শুধু অর্থ-বা সম্পদের মধ্যে সীমিত রাখছ কেন? উত্তম ঋণের বড় অংশতো তোমাদের সৎকর্মের সংশোধন সংক্রান্ত। তোমাদের সৎকর্মের দ্বারা আল্লাহ্‌তাআলার পেট ভরে যাবে। অতএব, ইহা অতি চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত যে, করযে হাসানা বা উত্তম ঋণ কে জগতের সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিও না। উত্তম ঋণের বড় অংশ তোমাদের সৎকর্মের সংশোধন সংক্রান্ত। নামায যখন তোমরা বড় আন্তরিকতার সাথে আদায় কর, যখন রোযা বড় সততার সাথে পালন কর, অনুরূপ অন্যান্য সৎকর্ম পালন করলে এসবই তোমাদের–'করযে হাসানা' এই উত্তম ঋণ দিয়ে আল্লাহ্‌র পেট ভরবে না (নাউযুবিল্লাহ)। তোমাদের সৎকর্মের উত্তম পুরস্কার দিবেন। পেট যদি ভরেই তবে তোমাদের পেট ভরবে। **হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর এই ব্যাখানুযায়ী আমাদের অন্যান্য সৎকর্মের অংশ হচ্ছে চাঁদা। যা তোমাদিগকে ফেরত দেয়া হবে। ইহার কবুলীয়ত সুফল জামাতী আকারেও প্রকাশ পাবে। ঐ সেই চাঁদার ফলে জামাতের জনশক্তি ও আর্থিক শক্তি বড় রকমের বৃদ্ধি পাবে। আর তোমাদের যে আকাঙ্খা অর্থাৎ চূড়ান্ত বিজয় তা পূর্ণ হবে।** এই সমস্ত ব্যবস্থাপনা ও কর্মকান্ড ঐ বিষয়কে তরান্বিত করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব, উত্তম ঋণের বিষয়টি অনেক প্রশস্ত হয়ে গেছে। আমাদের সবাইকে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করা উচিত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন; "আল্লাহ্‌র বড় মহিমার বিষয় এই যে, আল্লাহ্‌র সাথে, যিনি প্রতিপালক, বান্দার একটি দৃঢ় সম্পর্কের বন্ধন আছে। এই সম্পর্কে চিন্তা করলে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। কেননা, আল্লাহ্‌তাআলা বান্দার কোন সৎকর্ম, কোন প্রার্থনা ছাড়াই লালন পালন করেন। কাফের বা মু'মিন পৃথক না করে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের লালন-পালন করেন। সকলকে তাঁর রবুবিয়্যতের কল্যাণ এবং তাঁর রহমানীয়্যতের অনুগ্রহ দান করছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলার বিরুদ্ধে অভিযোগ অনর্থক। তিনি এমন প্রভু, যিনি কোন প্রার্থনা ছাড়াই মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তা পূর্ণ করেন। তোমরা তো মূর্খ। সামান্য কৃতিত্বেই মনে কর অনেক বড় কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে গিয়েছে। তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কী প্রয়োজন থাকতে পারে। – যিনি সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর প্রাণীকেও তিনি রিযিক দিয়ে থাকেন। তাদেরও রিযিক দিচ্ছেন যারা তাঁর ধর্মের বিরোধী। তাদেরও রিযিক দিচ্ছেন যারা তাঁর পুত্র সন্তান বানিয়ে রেখেছে। তাদেরও রিযিক দিচ্ছেন যারা তাঁর সত্তাকেই অস্বীকার করেছে – এমন সমগ্র জগতের প্রতিপালকের করুণা ও কৃপা-দৃষ্টি এই আয়াতকে বুঝতে সহায়ক হওয়া উচিত। নাকি বিপরীত অনুবাদ করবে ? অতএব এমন প্রতিটি অর্থ যা আল্লাহ্‌, মহান রবুবিয়্যতের বিরুদ্ধে করা হবে ("ইউরেকযুল্লাহু কারযান হাসানা" আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান) তা বিফলে যাবে। উক্ত আয়াতের তফসীর এই আয়াতে আছে – "মাইঁইয়ামাল মিসকালা যার্‌রাতিন খায়রাইঁয়ারাহ্‌।" অর্থাৎ– তুমি যদি অতি সামান্য পরিমাণ ভাল কাজও কর তার প্রতি আল্লাহ্‌র দৃষ্টি আছে এবং তিনি তার প্রতিদান উত্তমভাবে ফিরত দিবেন অর্থাৎ এরূপ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এই

আয়াতকে না বুঝে নিয়ে যাওয়া বা অভিযোগ করা ধ্বংস বৈ আর কিছুই নয়।

এখন আমি ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করছি এবং ইহার কিছু বিবরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। ওয়াকফে জাদীদের ৪২তম বর্ষ সীমাহীন কল্যাণ রেখে ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ইং শেষ হয়ে গেল। এখন আমরা ওয়াকফে জাদীদের ৪৩ তম বর্ষে প্রবেশ করছি।

নববর্ষের ঘোষণার সময় ইতোপূর্বে অনেক কিছু পরিসংখ্যান পেশ করা হতো কিন্তু এ ধরনের পরিসংখ্যান বা হিসেবের বিষয় সবাই ভাল করে অনুধাবন করতে পারে না। তারা শুধু বসে বসে ঝিমুতে থাকে। কেননা, এ ধরনের পরিসংখ্যান সম্পর্কে খুব অল্প মানুষই জ্ঞান রাখে। তাছাড়া সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। এ সব বিষয়ে বুঝতে বিশেষ দক্ষতা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই এমন পরিসংখ্যানকে বর্ণনা করছি না। শুধু মাত্র এমন তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যা শুনে আপনারা অনুপ্রাণিত হবেন।

সর্ব প্রথমে আমাদের ব্যবস্থাপনার (নেযাম) একটি পরিবর্তনের কথা বলছি। আল্লাহ্‌র ফযলে জামাতে এখন এক কোটির বেশী নব দীক্ষিত আহমদীদের সমাগম ঘটেছে। এমন নব দীক্ষিত আহমদীদের তরবীয়তের জন্য আমরা যে সব ব্যবস্থা নিচ্ছি – তা যথেষ্ট হচ্ছে না। যদি আমরা ওয়াকফে জাদীদের মাধ্যমে তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে থাকতাম তবে তাদের ঈমান ও এখলাস সততা বৃদ্ধির বড় একটা উপায় হতো।

অতএব, আগামীতে প্রত্যেক জামাতে নবাগতদের জন্য পৃথক সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ নিযুক্ত হবেন। নব নিযুক্ত এই সেক্রেটারী শুধু মাত্র নবাগতদের জন্য কাজ করেন। প্রত্যেককে ওয়াকফে জাদীদে শামিল করতে হবে। যদি কেউ এক আনা পরিমাণ দেন তবে তা-ও গ্রহণ করা হবে। কিন্তু নবাগতদের সবাইকে শামিল করার চেষ্টা নিতে হবে যদি তা করা হয় তবে আগামীতে এদের সংখ্যা (চাঁদা দাতার সংখ্যা) লক্ষের কোঠা পেরিয়ে কোটির কোঠায় পৌছে যাবে। আর এইভাবে –ওয়াকফে জাদীদের এই কল্যাণ, অনেক বড় কল্যাণ প্রমাণিত হবে। সর্ব সাধারণের জন্য কল্যাণবহ হবে এবং অনাদিকাল পর্যন্ত মানবজাতির জন্য এই কল্যাণ প্রবহমান থাকবে।

অতএব, আজ থেকে প্রত্যেক জামাতে একজন পূর্ণমানের সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদে নিযুক্ত হবেন যিনি শুধু মাত্র নবদীক্ষিতদের(নওমোবাইন) জন্য কাজ করবেন। আর যিনি পূর্বের সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ আছেন পূর্বের মতই পুরাতনদের ওয়াদা গ্রহণ, আদায়, বৃদ্ধি এবং শিশু-কিশোরদের তালিকাভুক্ত করা ইত্যাদি কাজ করবেন। চাঁদা বাড়াতে চেষ্টা করবেন। এ কাজ পৃথক চলতে থাকবে। আগামীতে বড় চমৎকার ফলাফল সামনে আসবে, ইনশাল্লাহ্‌।

আজ আমাদের হাতে যে রিপোর্ট এসেছে, এতে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৭ইং সনের সমাপ্তি £১০,৮২,৩৯৮/= দশলক্ষ বিরাশি হাজার তিনশ' আটানব্বই পাউন্ড আদায় হয়েছে। টাকার হিসাবে বললে যা বহুকাল থেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রা কেউ যেন এমন বলতে না পারেন যে, এই পরিসংখ্যানের মধ্যে মুদ্রাস্ফিতির প্রভাব আছে। অনেকে এমন আছেন যারা পরিসংখ্যনের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন। সমালোচনা করেন। খুশীর খবরকে সমালোচনার মধ্যে নিতে দ্বিধা করেন না। তাই আমি £১০,৮২,০০০ পাউন্ডের কথা বলছি। যদিও পাউন্ডের মান সামান্য নিম্নমুখী হয়েছে তবুও তা অতি সামান্য।

১৯৮২ইং সনে আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে খেলাফতের আসনে বসিয়েছিলেন। তখন পৃথিবীর সকল দেশের সমস্ত জামাতের সকল চাঁদার (পাকিস্তান সহ) মোট পরিমাণ ছিল পাঁচকোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা। আমি টাকার হিসাব চাইনি। কিন্তু তারা ঐ সময়ের হিসাব টাকায় বর্ণনা করেছেন। প্রথমবার যখন ১৯৮৫ ইং সনে ওয়াকফে জাদীদের আওতায় পৃথিবীর সকল দেশের জামাতকে শামেল করা হয়েছিল, তখন প্রথম বৎসর ওয়াকফে জাদীদের মোট আদায় ছিল ১১,৪০,০০০/= এগার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা। (মোবারক জাফর সাহেব টাকার হিসাবে দেখিয়েছেন তুলনা করে দেখাবার জন্য যে, প্রবৃদ্ধি কত?) আজ আল্লাহ্‌র ফযলে ওয়াকফে জাদীদের মোট আদায় ৫,৮৪,০০,০০০/= পাঁচ কোটি চুরাশি লক্ষ টাকা। যেভাবেই হিসাবকে দেখুন না কেন এতবড় প্রবৃদ্ধি যে কোনমতেই অবহেলা করা যায় না। টাকার অবমূল্যায়নকে সামনে রেখেও যদি হিসাব করেন তবুও এটা এত বড় প্রবৃদ্ধি যে কোনভাবেই ইহার ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হবে না। টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে বলে টাকার মান কত কম ধরবেন? যা-ই ধরুন এগার লক্ষের তুলনায় পাঁচকোটি চুরাশি লক্ষ টাকার বৃদ্ধি অনেক বড় বৃদ্ধি।

পৃথিবীর সমস্ত দেশের চাঁদার পরিমাণ হিসাব করে প্রথম দশটি দেশের অবস্থান ঘোষণা করছি। **সর্ব প্রথম আমেরিকা। দ্বিতীয় স্থানে পাকিস্তান।** পাকিস্তানের জন্য ইহা একটি বড় সম্মানজনক স্থান। বিভিন্ন প্রকার প্রতিকুলতা ও চরম বিরোধিতার মধ্যেও তারা ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা কম করেন নি। **তৃতীয় স্থানে জার্মানী।** জার্মানী তার নিজ স্থানে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। তাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। তারা যেন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা বাড়াতে গিয়ে অন্যান্য চাঁদা কম না করে ফেলেন। নেযাম (শৃঙ্খলা) বিনষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ আপনাদিগকে তৃতীয় স্থান দিয়েছেন। ইহা বড় কথা। সাধারণ যে কোন প্রতিযোগিতার ফলাফলে প্রথম তিনটি স্থানের উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

চতুর্থ স্থানে ইংল্যাণ্ড। পঞ্চম ক্যানাডা, ষষ্ঠ স্থানে ভারত। ভারতের জন্য এটি একটি বিশেষ ঘটনা। তারা ওয়াকফে জাদীদে বিরাট অগ্রগতি লাভ করেছে। বড় বড় শক্তিশালী দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। **সপ্তম সুইজারল্যাণ্ড। অষ্টম ইন্দোনেশিয়া. নবম নরওয়ে, দশম মরিশাস।** এবার বলছি মাথা পিছু চাঁদার পরিমাণের দিক থেকে কোন্ দেশের গড়ে মাথাপিছু চাঁদার পরিমাণ বেশী। এ ক্ষেত্রেও **আমেরিকা প্রথম স্থানে** আছে। আমেরিকা প্রত্যেকে গড়ে মাথাপিছু ১০৫ পাউণ্ড হারে ওয়াকফে জাদীদে চাঁদা দিয়েছেন। যদিও তারা চাঁদা দাতাদের সংখ্যা বাড়িয়েছে, ছোট ছেলেমেয়েদের তালিকাভুক্ত করেছেন। তারপরও তাদের গড় চাঁদা ১০৫ পাউণ্ড । সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে মাথাপিছু গড় চাঁদার উচ্চ হার কম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। **দ্বিতীয় স্থানে সুইজারল্যাণ্ড।** গড়ে তাদের মাথাপিছু চাঁদা ৬৩ পাউণ্ড। অর্থাৎ আমেরিকা এত বেশী অগ্রসর হয়ে গেছে যে, এদের পিছনে ফেলে কেউই আগে যাবে এমন সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। দোয়া করেন এদের জন্য।

আল্লাহ্‌র ফযলে আমেরিকা এমন একজন আমীর পেয়েছেন যিনি

অনেক বড় অর্থনীতিবিদ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নকারী। আমেরিকা ব্যাবস্থাপনার দিক থেকে দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে। এ জন্য আমীর সাহেবের দক্ষতা প্রশংসনীয়। তিনি এই যোগ্যতা তাঁর পিতা হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ)-এর নিকট থেকে পেয়েছেন। যে কোন বিষয়ে বড় গভীরে প্রবেশ করে খুব সুচিন্তিত সুন্দর পরিকল্পনা করতে পারেন। পরিকল্পনা গ্রহণের দক্ষতার জন্য তিনি কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন নি। তিনি তা নিজ বুযুর্গ পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। অতঃপর এই যোগ্যতাকে আগে বাড়িয়েছেন। এভাবে অগ্রসর হওয়া বুযুর্গদের জন্য কোন বেআদবী নয়। তাঁরাও তো এই দোয়াই করেছিলেন যে, তাঁদের সন্তান যেন আরো অগ্রগামী হয়। অতএব, তাঁদের আশা পূরণ হয়েছে। এখানে আপত্তির কিছু নেই।

সুইজারল্যাণ্ডের পরে জাপানের স্থান। তাদের মাথাপিছু গড়ে চাঁদা ৩০ পাউণ্ড। জাপানের উপর যে আর্থিক বিপর্যয় নেমে এসেছে সে দিক থেকে বিচার করলে তাদের এই কুরবানী প্রত্যেকে গড়ে মাথাপিছু ৩০ পাউণ্ড অনেক বড় কুরবানী। অনেকে সেখান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। অনেকের ব্যবসায় বিরাট ক্ষতি হয়েছে।

চতুর্থ স্থানে বেলজিয়াম। মাথাপিছু গড়ে ১১ পাউণ্ড ৬৪ পেন্স। বেলজিয়ামের মত জামাতের জন্য এটি একটি বড় কুরবানী, বড় প্রশংসনীয়। অনেকে সেখানে বেকার আছেন। বেকার ভাতা থেকে চাঁদা দিচ্ছেন। জার্মানী মাত্র কয়েক পেন্সে বেলজিয়ামের পেছনে পড়ে গেছেন। **জার্মানীর গড় মাথাপিছু চাঁদা ১১ পাউণ্ড ৫০ পেন্স**। বেলজিয়াম ১১ পাউণ্ড ৬৪ পেন্স। মাত্র ১৪ পেন্সের ব্যবধানে জার্মানী বেলজিয়ামের পেছনে। আমার পক্ষ থেকে জার্মানীর জন্য অনুমতি আছে। তারা ইচ্ছা করলে এই ব্যবধান মিটিয়ে বেলজিয়ামকে পেছনে রেখে তারা উপরের স্থান দখল করতে পারেন।

এবার চাঁদা দাতাদের সংখ্যার কথা বলছি। ১৯৯৬ ইং সনে সারা পৃথিবীতে ওয়াকফে জাদীদে মোট চাঁদা দাতার সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৯৪। ১৯৯৭ইং এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ২২ হাজার ৬২৮ জন। আমি আগেও বলেছিলাম যে চাঁদাদাতার সংখ্যা বাড়াবার জন্য চেষ্টা করবেন। যে ব্যক্তি একবার চাঁদাদাতাদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায় সে বিশেষ অনুগ্রহের তথা 'করযে হাসানা'-উত্তম ঋণের বরকতের আওতাভুক্ত হয়ে যায়। তার মাল, ধন-সম্পদে কল্যাণ লাভ হতে আরম্ভ হয়ে যায়। এমন শিশু-কিশোর যারা চাঁদার তালিকায় এসে যায় তারা বড় হয়ে তাদের আয় থেকে চাঁদা দিতে আরম্ভ করবে। অতএব, এভাবে ওয়াকফে জাদীদকে ভবিষ্যতের প্রজন্মের তরবীয়তের জন্য ব্যবহার করুন। বিপুল সংখ্যায় ওয়াকফে জাদীদের চাঁদাদাতাদের সংখ্যা বাড়াবেন। **যদি কেউ খুবই কম চাঁদা দেন তা-ও গ্রহণ করুন। কিন্তু অংশ গ্রহণ করাতে চেষ্টা করুন**। আল্লাহ্‌র ফযলে আপনারা দৃষ্টি দিয়েছেন ফলে সংখ্যা ২ লক্ষ ২২,৬২৮ এ পৌঁছেছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

অবশেষে আমি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ স্থান দখলকারী জামাতের নাম পড়ছি যারা ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায়ের প্রতিযোগিতায় স্থান লাভ করেছেন। **প্রথম স্থান পূর্বের মতোই করাচীর দখলে আছে**। গত বছর তাদের সাথে হয়ত সামান্য অবিচার হয়েছিল। সম্ভবতঃ সংখ্যা ঠিকমত পড়া হয়নি, অথবা রির্পোট আসতে দেরী হয়েছিল – তাদের নাম দ্বিতীয় স্থানে ঘোষণা হয়েছিল। পরে তারা আমাকে জানালে দেখা গেল যে, তারা প্রথম স্থানে ছিলেন। অতএব, করাচী প্রথম স্থান লাভ করেছে।

২য় স্থানে রাব্‌ওয়াহ আছে। রাবওয়ার এই কুরবানী সারা পৃথিবীর বহু দেশের অংশ আছে। বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত প্রবাসীরা দেশে টাকা পাঠান। রাব্‌ওয়ার অধিকাংশ চাঁদা বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা থেকে দেয়া চাঁদা। এদিক থেকে সারা পৃথিবীর জামাত এতে শামেল আছে। কিন্তু তারপরও রাব্‌ওয়ার স্থান আছে। কারণ টাকাটা রাব্‌ওয়ায় পৌঁছে তারপর আদায় হয়েছে। **তৃতীয় স্থানে লাহোর**। এই হল প্রথম তিন জামাতের নাম।

তারপরের দশটি জেলার নাম ও অবস্থান এখন জানাচ্ছি। তারাও যেন দোয়ার মধ্যে অংশ পেতে পারেন।

প্রথম ইসলামাবাদ, সকল জেলাসমূহের মধ্যে প্রথম স্থান। **রাওয়ালপিণ্ডি দ্বিতীয় স্থান**। সমস্ত জেলাসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান। আমি বুঝতে পারি না যে, এই দুই জেলা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তরবীয়তি কর্মকাণ্ডে তেমন অগ্রগামী না, কিন্তু ওয়াকফে জাদীদে তারা স্থান লাভ করে। তা-ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বটে। আল্লাহ্ মুবারক করুন। অন্য সকল উন্নয়নমূলক প্রোগ্রামেও তারা অগ্রগামী হোক। **তারপর সিয়ালকোট**। সিয়ালকোট জেলাও সাধারণতঃ পেছনের সারির জেলাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর যুগে এই জেলার বুযুর্গানে কেরাম বড় বড় পতাকা বহন করতেন। ঐ পতাকাগুলোকে তারা এখন নিজ নিজ ঘরে রেখে দিয়েছেন। অবশেষে এই জেলা কার্যত: শত্রুদের হাতে চলে গিয়েছে। তাদের মধ্যে আমীরের বিরোধিতার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। প্রথম যুগে এই জামাত সম্পর্কে এমন কল্পনাও করা যেত না। আমি অবশ্য এই জেলার উন্নতির জন্যে ক্রমাগত চেষ্টায় আছি। দেখা যাক কি করে এদরকে সামনে এগিয়ে নেয়া যায় বস্তুতঃ এটাতো স্বীকার করতেই হচ্ছে যে, এই জেলা **তৃতীয় স্থানে** এসে গেছে।

ফয়সালাবাদ **চতুর্থ স্থানে**। **পঞ্চম** গুজরাঁওয়ালা। **ষষ্ঠ স্থানে** শেখোপুরা। শেখোপুরা সম্ভবতঃ চৌধুরী আনোয়ার হোসেন মরহুমকে স্মরণ করছে। তার ছেলে শুনছেন নিশ্চয়। নিজ বুযুর্গ পিতার নামকে স্মরণ রাখুন। যেভাবে তিনি বিভিন্ন ময়দানে অগ্রগামী ছিলেন আপনিও চেষ্টা করুন। **ওমরকোট সপ্তম**। আশ্চর্যের বিষয় সিন্ধুর ছোট্ট একটি জেলা কীভাবে ওপরে এসে গেছে।

গুজরাট অষ্টম স্থান লাভ করেছে। গুজরাটীদের অষ্টম স্থান লাভের কারণও হয়ত এই যে, এরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছেন। যারা বিদেশে আছেন তারা দেশের আত্মীয়দের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। গুজরাটীরা সবাই নিজ নিজ গ্রামে আত্মীয়দের নামে টাকা পাঠান। আর তারাও টাকা পেয়ে সেখান থেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করেন। আল্লাহ্‌র ফযলে তারা ধর্মের খেদমত করেন।

কোয়েটা নবম স্থানে আছে। আর **দশম স্থানে সারগোধা**। আজ এখানেই সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

অনুবাদ: মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী,
সদর মুরব্বী

মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক মহান ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর একটি ইলহাম – "তেরি উকদাকুশাই হুশিয়ারপুর মে হোগী" – অনুযায়ী কাদিয়ান হতে হুশিয়ারপুর গমন করে নির্জনে ৪০ দিন (চিল্লাকশি) আরাধনায় থেকে আল্লাহ্তাআলার নিকট বিশেষভাবে দোয়া করেন এবং দীনে ইসলামের সত্যতা ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য সর্বশক্তিমান খোদার নিকট নিদর্শন কামনা করেন। উহার উত্তরে আল্লাহ্তাআলার তরফ হতে তাঁর নিকট সুদীর্ঘ শুভ সমাচার আসে। উহার মধ্যে তাঁকে ইসলাম ও আহমদীয়ত সম্বন্ধে অসাধারণ অদৃশ্যের বিপুল সূক্ষ্ম সংবাদ জানানো হয় এবং উহার মধ্যেই মুসলেহ্ মাওউদ তথা মহান সংস্কারক পুত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত সুসমচার দেয়া হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ঐ সকল ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী ১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে একটি প্রচার লিপির মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এর নাম হলো সবুজ ইশ্তেহার। উহার জরুরী অংশগুলো নিম্নে দেওয়া হল:

মুসলেহ্ মাওউদ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

মহান ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত আকদস (আঃ) বলেনঃ

"পরম কারুণিক, পরম দাতা মহিমান্বিত খোদা যিনি সর্বশক্তিমান – যাঁর মর্যাদা মহাগৌরবময় এবং নাম অতীব মহান, আপন ইলহাম দ্বারা সম্বোধনপূর্বক বলেনঃ

"আমি তোমাকে এক করুণার নিদর্শন দিতেছি। তুমি যেভাবে আমার নিকট চাহিয়াছ তদনুযায়ী আমি তোমার সকরুণ নিবেদনসমূহ শুনিয়াছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে করুণা সহকারে কবুল করিয়াছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানায়) তোমার জন্য কল্যাণময় করিয়াছি। সুতরাং শক্তির দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হইতেছ।

নিদর্শনের উদ্দেশ্য ঃ খোদা বলিয়াছেন, যাহারা জীবন-প্রত্যাশী তাহারা যেন মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি লাভ করে। যাহাতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্তাআলার কালামের মর্যাদা লোকের নিকট প্রকাশিত হয় এবং সত্য উহার যাবতীয় আশিসসহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা উহার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি সর্বশক্তিমান যাহা ইচ্ছা করি, করিয়া থাকি এবং যেন তাহাদের প্রতীতি জন্মে যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যাহারা অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম এবং কেতাব এবং তাঁহার রসূল পাক মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-কে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করিয়া থাকে, তাহারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার

হয়।

মুসলেহ্ মাওউদের অসাধারণ গুণাবলী ও কার্যাবলীঃ

সুতরাং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হইবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করিবে। সেই পুত্র তোমারই সন্তান হইবে।

সুশ্রী, পবিত্র পুত্র তোমার মেহমান আসিতেছে। তাহার নাম আনমুয়ায়েল এবং সুসংবাদ দাতাও বটে .....।

তাহার সঙ্গে ফযল (বিশেষ কৃপা) আছে, যাহা তাহার আগমনের সহিত উপস্থিত হইবে। সে জাঁক-জমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হইবে। সে পৃথিবীতে আসিবে এবং তাহার সঞ্জীবনী শক্তি এবং পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধি মুক্ত করিবে। সে কলেমাতুল্লাহ্ – আল্লাহ্‌র বাণী। কারণ খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাহাকে সম্মানিত বাক্যদ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হইবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাহাকে পরিপূর্ণ করা হইবে। সে তিনকে চার করিবে (ইহার অর্থ বুঝি নাই)। সোমবার শুভ সোমবার। সম্মানিত মহৎ, প্রিয় পুত্র।

মাযহারুল হাক্কে ওয়াল উলা কায়ান্নাল্লাহা
নাযালা মিনাস্ সামায়ে

অর্থাৎ, সত্যের বিকাশস্থল ও সুউচ্চ যেন আল্লাহ্ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। "তাহার আগমন অশেষ কল্যাণময় হইবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হইবে। জ্যোতিঃ আসিতেছে; জ্যোতিঃ। খোদা তাহাকে তাঁহার সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহার মধ্যে আপন রূহ ফুকিয়া দিব এবং খোদার ছায়া তাহার শিরে থাকিবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধিলাভ করিবে এবং বন্দীদিগের মুক্তির উপায়স্বরূপ হইবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। জাতিগণ তাহার নিকট হইতে আশিস লাভ করিবে। তখন তাহার আত্মিক কেন্দ্রের আকাশের দিকে উত্তোলিত হইবে। – ওয়া কানা আমরাল্লাকযিয়া "(অর্থাৎ ইহাই আল্লাহ্‌র অটল মীমাংসা)।"

(ইশ্‌তেহার ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ ইং)

অতঃপর ১৮৮৬ সালের ২২শে মার্চ আর একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এ-ও ঘোষণা করেন যে, উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অসাধারণ গুণসম্পন্ন মহান পুত্র মাত্র নয় বছরের মধ্যে অবশ্যই জন্মলাভ করবে। সুতরাং এই নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই তৃতীয় বছর অর্থাৎ ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে 'শুভ সোমবার' প্রতিশ্রুত পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর পবিত্র নাম ১৮৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বরের ইশ্‌তেহারে প্রকাশিত ইলহাম অনুযায়ী বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ রাখা হয়। তাঁর জন্মের পূর্বে এবং জন্মের পরও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ইলহাম মারফত অবগত হয়ে নির্দিষ্টভাবে তাঁর সম্বন্ধে ইহা প্রকাশ করেন যে, মুসলেহ্ মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক পুত্র) তিনিই। তিনি ১৯১৪ সনের ১৪ই মার্চ আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হন। তাঁর ৫২ বছর ব্যাপী সুদীর্ঘ খেলাফতকালীন বিপুল ঘটনাবলী প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় সাক্ষ্য প্রদান করে যে, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেকটি বাক্য তাঁর মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং তিনি নিজেও আল্লাহ্‌তাআলার নিকট হতে ইলহামপ্রাপ্ত হয়ে ১৯৪৪ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মুসলেহ্ মাওউদ হবার দাবী করেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান ইসলাম প্রচার কেন্দ্রসমূহ ও বিপুল সংখ্যক উন্নতিশীল জামাত এবং তাঁর লিখিত কুরআন শরীফের তুলনাহীন অমূল্য তফসীর, (তফসীরে কবীর ও তফসীরে সগীর) জ্ঞান ও তত্ত্বপূর্ণ অসংখ্য পুস্তক, খুৎবা ও বক্তৃতা এবং তাঁর দ্বারা জামাত ও নেযামে খেলাফতের দৃঢ় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠা জীবন্ত খোদার জীবন্ত দর্শনকে চির অম্লান ও সমুজ্জ্বল রাখছে এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার স্বাক্ষর হয়ে আছে ও থাকবে। ইনশাল্লাহ্। *(পুনঃপ্রকাশিত)*

মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরব্বী

মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করুন

২০ শে ফেব্রুয়ারী আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের এ দিনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক মহান পুত্রের সুসংবাদ লাভ করেন। ইহা মহান মুসলেহ মাওউদ-এর ভবিষ্যদ্বাণী নামে খ্যাত। এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার ফলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, ইসলামের সত্যতা, এবং হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হয়েছে।

সুতরাং এ দিনের গুরুত্বকে জামাতের নিকট, বিশেষ করে নব-প্রজন্ম ও নব-দীক্ষিতগণের নিকট উপস্থাপন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশেল সকল জামাতকে সভা-সমিতির আয়োজন, আতফাল-নাসেরাতের খেলা-ধূলা এবং মিষ্টি বিতরণ প্রভৃতি নির্দেশ আনন্দ-স্ফূর্তির মাধ্যমে পালন করার জন্য নির্দেশ পাঠাতেও অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ন্যাশনাল আমীর

জামাতী নির্বাচন

আগামী ৩ বছরের জন্য স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট ও তাদের মজলিসে আমেলার নির্বাচনের জন্যে প্রত্যেক জামাতে নির্বাচনী তপসীল পাঠানো হয়েছে। ৩০ শে এপ্রিল '৯৮ তরিখের মধ্যে সকল জামাতের নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া জরুরী। যাতে নির্বাচিত আমীর/প্রেসিডেন্ট ও নোমায়েন্দা কর্তৃক মজলিসে শূরা '৯৮ এর কাজ নির্বাহ করা যায়। নির্বাচনী তপসীল যদি কোন জামাত না পেয়ে না থাকেন তাদেরকে সত্বর নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। নির্বাচনের পূর্বে যাতে ভোটার তালিকা সঠিকভাবে প্রণীত হয় সেজন্যে চাঁদা আদায়ের প্রতি তৎপর হতেও অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ন্যাশনাল আমীর

সালানা জলসা উপলক্ষ্যে

হযরত আল্‌হাজ্জ হেকিম নূরুদ্দীন
খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল(রাঃ)

আহমদী জামাতের প্রথম খলীফা হযরত আল্‌হাজ্জ হেকিম নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল(রাঃ) সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

"আমি পুনরায় তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আদেশ পৌছাচ্ছি। শোন আর মনযোগ দিয়ে শোন।

'ওয়া তাসিমূ বি হাবলিল্লাহি জামি'আওঁয়ালা তাফার্‌রাকূ' (অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে মজবুতভাবে ধরো, বিভক্ত হয়ো না) দেখো বিভক্ত হয়ো না, যদি বিভক্ত হও তাহলে জানো কি উহার ফল কী হবে? আর এর সাথে সাথে তোমরাও অন্তঃসারশূন্য হয়ে যাবে। খোদাতাআলা বলেন, 'ওয়ালা তানাযাউ ফা তাফশালূ ওয়া তাযহাবা রীহুকুম' (অর্থাৎ তোমরা পরস্পর বিবাদ- বিসম্বাদ করো না অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে)

যদি পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ করো তাহলে তোমরা অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়বে। তোমরা শক্তিহীন হয়ে যাবে। ফলে তোমাদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরে তোমাদের শক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং শত্রু তোমাদের ওপরে প্রবল হয়ে পড়বে।"

(১৯১১ সনের সালানা জলসায় প্রদত্ত, তাং ২৬- ২৯ ডিসেম্বর)

হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)

হযরত মুসলেহ মাওউদ হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ) জলসার শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বলেন, "আমি আল্লাহ্‌তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় আমাদের পুনরায় একবার তাঁর ঐ নিদর্শনকে পূর্ণকারী সাব্যস্ত করেছেন, যা তিনি তাঁর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও রসূলগণের জন্যে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আবার তিনি আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দিয়েছেন যে, কোন পার্থিব সম্মানের জন্যে নহে; পার্থিব কোন প্রত্যাশায় নহে, কোন ধন-সম্পদের জন্যে নহে, কোন আরাম-আয়েশের জন্যে নহে বরং কেবল তাঁর সত্তা ও তাঁর নামকে সমুন্নত করার জন্যে, তাঁর ওপরে ঈমান প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এস্থানে সমবেত হয়েছি। আর আমি আল্লাহ্‌তাআলার নিকট এর জন্যে দোয়া করছি যেন তিনি আমাদের নিয়্যত ও সংকল্পকে সঠিক করে দেন এবং আমাদের আমল ও কর্মকে নিষ্ঠাপূর্ণ করে দেন।

(সালানা জলসা, ২৭-১২-১৯২৫ ইং)

সালানা জলসা উপলক্ষ্যে

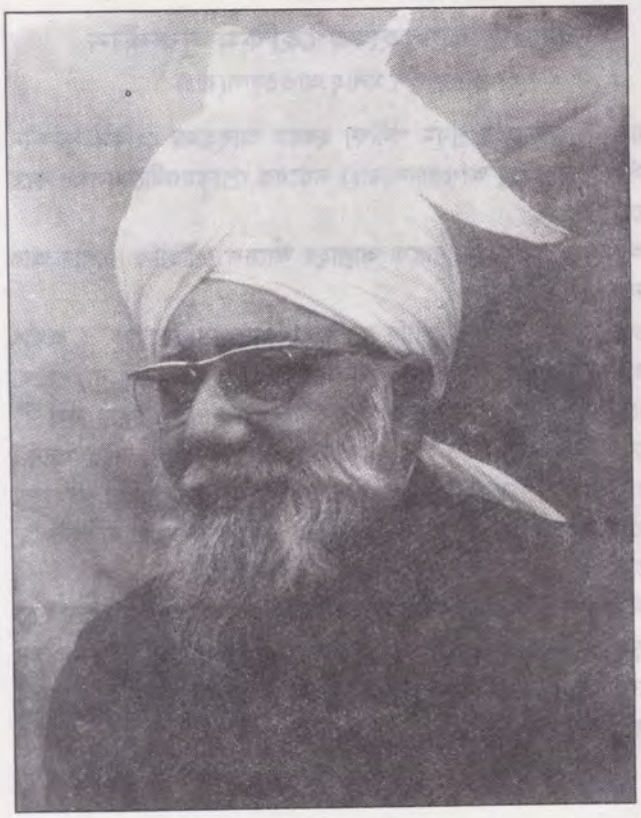

হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)

হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) সমবেত আহমদীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

"আমি তোমাদিগকে বলছি যে, জগৎ থেকে অশান্তি ও ঝগড়া-বিবাদের অবসান ঘটবে এবং অবসান ঘটবে আমার ও আপনাদের হাতেই। কিন্তু এর জন্যে আমাদের বহু কুরবানী পেশ করতে হবে। আর ঐসব কুরবানী আমরা পেশ করবোও, ইনশাআল্লাহ্। হযরত নবী আকরম (সাল্লাঃ) একটি পবিত্র নাম, মূর্তিমান কল্যাণ এবং তাঁর (সাল্লাঃ) উম্মত কল্যাণ ও হিতৈষণার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। কাকেও দুঃখ দিবে না, কারও অনিষ্ট করবে না, পাপ, দুঃখ-কষ্ট, অশান্তি ও উদ্বেগের অগ্নিকুন্ডে দগ্ধমান জগৎ থেকে এসব কিছুর অবসান ঘটিয়ে পরিপার্শ্বিকতা ও জীবন যাত্রায় আনন্দ ও শান্তি ছড়িয়ে দিতে সযত্নে চেষ্টিত হতে হবে, যাতে জগৎ উপলব্ধি করতে পারে যে,হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাঃ) বাস্তবিকই জগতের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত কল্যাণকারী....., দোয়া করুন যেন আল্লাহ্তাআলা আমাদের সৌভাগ্য দান করেন যাতে আমরা আমাদের দায়িত্বাবলী হৃদয়ঙ্গম করতে পারি এবং সেগুলোকে পালন ও বাস্তবায়ন করতে পারি। খোদাতাআলার সমীপে কিছু সওগাত পেশ করতে পারি। আর দোয়া শুধু দোয়া এবং অশেষ ও অসাধারণ দোয়ার মাধ্যমে তাঁর আশিস ও কৃপা আহোরণ ও আকর্ষণ করতে পারি, আমীন'। *(সালানা জলসা, ২৬-১২-১৯৮০ ইং)*

হযরত মির্যা তাহের আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) সমবেত আহমদীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

"আজ ইসলামের প্রারম্ভ কালের কথা-বার্তা বলাকালীন সময়ে আমাদের উচিত হযরত নবী করীম (সাল্লাঃ)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করা। তিনি ছিলেন মুহ্সেনে আযম সর্বশ্রেষ্ঠ-হিতৈষী ও কল্যাণকারী রসূল। আর কত মহান ছিলো তাঁর গোলাম ও ভক্তদের শান ও মর্যাদা..... আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, দুনিয়া এদিক সেদিক হয়ে যেতে পারে, পৃথিবী ও আকাশমালা টলে যেতে পারে কিন্তু খোদাতাআলার তকদীর ও নিয়তি কখনও টলবে না। আবূ লাহাবী আগুন নিশ্চয় নূরে মুস্তাফা (সাল্লাঃ)-এর দ্বারা পরাজয় বরণ করবে। দুনিয়ার কোন শক্তি, কোন পাহাড়, কোন পর্বত বক্ষসমূহে পতিত হয়ে বেলালী কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে পারবে না। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' এর সত্যতা প্রচার ও ঘোষণা করা থেকে আমাদেরকে কোন দুঃখ-কষ্ট, কোন জ্বালা-যন্ত্রণা ক্ষান্ত ও বিরত রাখতে পারবে না। এ দীনে ইসলাম বিজয়ী হয়ে অবস্থান করার জন্যে এসেছে। ইহা পরাভূত হয়ে থাকার জন্যে আসেনি"।

(সালানা জলসা, ২৬-২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮২ইং)

নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)

ঘানাস্থ সল্টপন্ডে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত ঘানা-এর
বক্তৃতা দিতে দেখা যাচ্ছে (

ইউ কে সালানা জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ
রাবে'(আইঃ)-কে বক্তৃতা দিতে দেখা যাচ্ছে ।

১৯৯৬ সনে লন্ডনস্থ বাঙ্গালী আহ্‌মদীদের মাঝে প্রাক্ত
ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী এব
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী (বর্তমান ন্যাশনাল আমীর।

ানা জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে'(আইঃ)-কে
ব্রুয়ারী ১১-১২, ১৯৮৮ ইং)।

১৯৯৬ সনের আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠানে তদানিন্তন সেক্রেটারী তবলীগ আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী (বর্তমান ন্যাশনাল আমীর)-কে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যাচ্ছে।

ইউ কে সালানা জলসায় শ্রোতাবৃন্দের মাঝে আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী (বর্তমান ন্যাশনাল আমীর)

দারুল আমান কাদিয়ানের শত-বার্ষিকী জুবিলী জলসা-১৯৯১ ঈসাব্দ

১। হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) সভাপতিত্ব করছেন।

২। মিনারাতুল মসীহ্, কাদিয়ান।

৩। ঢাকা জামাতের আমীর প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী। পাশে ডঃ মোজাহেদ উদ্দিন আহ্মদ।

৪। আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী (বর্তমান ন্যাশনাল আমীর)-এর সাথে বাঙ্গালী আহমদীগণের একাংশ।

৫। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অন্যতম সাহাবী হযরত মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন। পাশে বাঙ্গালী আহ্মদী জনাব আবু নাসের।

খতমে নবুওয়ত ও আহমদীয়া জামাত

মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ
নাযীর লায়েলপুরী

সপ্তম কিস্তি

সপ্তম প্রশ্ন

মওদুদী সাহেব আমাদের এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারেন কি যে, হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালাম উপরোল্লিখিত আয়েতের পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদী উম্মতের ইমাম ও খলীফা হইয়া কী প্রকারে আসিতে পারেন?

নোট ঃ মওদুদী সাহেব 'খতমে নবুয়াত' পুস্তিকায় মসীহের নযূল সংক্রান্ত বিভিন্ন রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করিবার পর এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেনঃ

"অনুরূপ স্পষ্টভাবে দ্বিতীয় যে কথাটি এই হাদীসগুলো থেকে ব্যক্ত হয়, তা হলো এই যে, নবী হিসেবে হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের পুনরাগমন হইবে না। তাঁর ওপর অহী নাযীল হইবে না।"

['খতমে-নবুয়াত', বাঙলা সংস্করণ, ৬৪ পৃঃ]

এ সম্পর্কে নিবেদন এই যে, এই অভিমতের উভয় অংশই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে এই উভয় অংশেরই অপনোদন বা খণ্ডন রহিয়াছে। মওদুদী সাহেবও হযরত নওয়াস ইব্নে সামায়ান হইতে বর্ণিত এই হাদীসটি তাঁহার পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। [বাঙলা সংস্করণ, 'খতমে নবুয়াত, ৫৩ পৃঃ ১০নং রেওয়ায়াত] অবশ্য, তিনি জানিয়া বুঝিয়া হাদীসটি হইতে ঐ অংশ বাদ দিয়াছেন, যেখানে লিখিত আছে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম মুহাম্মদী উম্মতের প্রতিশ্রুত (মাওউদ) মসীহ্কে চারি বার "নবীউল্লাহ্" ('আল্লাহ্র নবী') বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মওদুদী সাহেব ইচ্ছা করিয়াই হাদীসের এই অংশদ্বয় বাদ দিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার উপরোক্ত এই ভ্রান্ত অভিমত রহস্যাবৃত থাকে যে, মসীহ্ মাওউদ নবী হিসাবে আসিবেন না এবং তাঁহার উপর অহী নাযেল হইবে না। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে ফরমাইয়াছেনঃ

"যখন মসীহ্ মাওউদ ইয়াজূজ মাজূজের সময় আসিবেন, তখন সেই 'মসীহ্ নবী-উল্লাহ্' (আল্লাহ্র নবী ঈসা) এবং তাঁহার সাহাবীগণ শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত ও অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবেন... ...তখন আবার 'নবী-উল্লাহ মসীহ্' (আল্লাহ্র নবী মসীহ্) এবং তাঁহার সাহাবা খোদার প্রতি মনোনিবেশ করিবেন তখন আবার 'নবী-উল্লাহ্ মসীহ্' (আল্লাহ্র নবী মসীহ্) ও তাঁহার সাথী এক বিশেষ স্থানে অবতরণ করিবেন। অতঃপর নবী-উল্লাহ্ মসীহ্ (আল্লাহ্র নবী মসীহ্) এবং তাঁহার সাহাবা খোদাতাআলার নিকট গভীরভাবে মোনাজাত করিবেন' (সহী মুসলিম বাব খুরুজুদ্দাজ্জাল)

অষ্টম প্রশ্ন

এখন মওদুদী সাহেবকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই হাদীসে পুনঃ পুনঃ চারি বার (ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া) রসূলুলাহ্" সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম মসীহ্ মাওউদকে "নবী-উল্লাহ্" ('আল্লাহ্র নবী') নির্ধারণ করা সত্ত্বেও তাঁহার কি অধিকার আছে যে, তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, মসীহ্ মাওউদ 'নবী হিসাবে আগমন করিবেন না'?

সুতরাং মওদুদী সাহেবের অভিমত উদ্দেশ্যমূলক এবং কল্পনাপ্রসূত এবং হাদীসের বিরোধী বলিয়া ভ্রান্ত ও অবান্তর। তারপর, এই হাদীসেই লিখিত আছে ঃ

"খোদাতা'আলা প্রতিশ্রুত ঈসাকে ওহী করিবেনঃ আমি কতক বান্দা (অর্থাৎ ইয়াজূজ মাজূজ) বাহির করিয়াছি, যাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার কাহারো শক্তি নাই'। ['সহীহ্ মুসলিম']

আশ্চর্যের বিষয়, রসূল করীম সাল্লালাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলেন যে, মসীহ্ মাওউদের উপর 'অহী নাযেল হইবে,' কিন্তু মওদুদী সাহেব মুসলমানদিগকে ইহা প্রত্যয় করাইতে চান যে, মসীহ মাওউদের উপর 'ওহী নাযেল হইবে না'। এখন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে মওদুদী সাহেবের এই ধারণাকে ভ্রান্তিকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ছাড়া মুসলমান মাত্রেরই গত্যন্তর নাই।

নবম প্রশ্ন

যদি মওদুদী সাহেব সম্পূর্ণ হাদীসটি উদ্ধৃত করিতেন, তাহা হইলে এই দুই কথার কোনটাই বলিতে পারিতেন না। এখন মওদুদী সাহেব বলুন যে, উদ্ধৃত করিবার সময় হাদীসের এই উভয় অংশকেই তিনি কেন বাদ দিয়াছেন? এজন্য নয় কি যে, তাঁহার অসত্যতা যেন দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া যায়?

উম্মতের উলামাগণও মসীহ্ মাওউদের মর্যাদা সম্বন্ধে এই ধর্ম-মতই পোষণ করেন যে, তিনি 'নবী-উল্লাহ্ বা 'আল্লাহ্র নবী' হইবেন এবং নবুওয়ত ছাড়িয়া আসিবেন না। নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ লিখিয়াছেনঃ

"যে ব্যক্তি বলে যে, হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালাম নাযেল হওয়ার সময় নবী থাকিবেন না, সে পাক্কা কাফের, যেমন ইমাম জালালুদ্দীন সাইয়ুতি ইহার ব্যাখা করিয়াছেন" (হুজাজুল কেরামাহ্, পৃষ্ঠা ৪৩১)।

অতঃপর তিনি লিখিয়াছেন :

"যদিও ঈসা আলায়হেস্ সালাম এই উম্মতের খলীফা হইবেন, কিন্তু তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী অবস্থা অনুসারে নবী ও রসূল হইবেন" [হুজাজুল কেরামাহ্, পৃষ্ঠা ৪২৬]।

হয়রত শেখ আকবর মুহীউদ্দীন ইবনুল-আরাবী আলায়হের রহমত লিখিয়াছেন :

"ঈসা আলায়হেস্ সালাম আমাদের মধ্যে শরীয়ত ছাড়া নাযেল হইবেন এবং নিশ্চয় তিনি নবী হইবেন" ['ফতোহাতে মক্কিয়া', প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৭০]।

হযরত মুহীউদ্দীন ইব্নুল্ আরাবী (রহমতুল্লাহে আলায়হে) এই

আকিদাও লিখিয়াছেনঃ
অজাবা নায়ুলূহু ফি আখেরিয্ যামানে বে-তা তালুকহি ফি বাদানে আখার্'
"হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালামের শেষ যুগে নযূল অন্য দেহের মাধ্যমে সংঘটিত হইবে। অর্থাৎ, হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালাম আদি দেহ অবলম্বনে নহে, 'বরুযীভাবে' (প্রতিবিম্বাকারে) আগমন করিবেন'
[তফসীরে ইবনুল আরাবী বর্ হাশিয়া 'আরায়েসুল্ বায়ান', পৃষ্ঠা ২৯২]
এক সম্প্রদায় সুফী ইহাই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। 'একতেবাসুল্ আন্ওয়ার' কেতাবের ৫২ পৃষ্ঠায়ও ইহাই লিখিত আছে। তাহা এইঃ
"কোন কোন সুফী বিশ্বাস করেন যে, ঈসা আলায়হেস্ সালামের আত্মা (অর্থাৎ, তাঁহার আধ্যাত্মিক গুণাবলী ও সৌন্দর্যরাশি) মাহ্দীর মধ্যে প্রতিবিম্বাকারে প্রকাশিত হইবে। ঈসা আলায়হেস্ সালামের নযূলের এই 'বরুয' অর্থ "লা মাহ্দী ইল্লা ঈসা" ("ঈসা ব্যতীত মাহ্দী নাই") হাদীস মুতাবেক" ['এক্তেবাসুল্ আন্ওয়ার']।
স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ
"শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে, তাহারা ঈসা ইব্নে মরিয়মকে ইমাম মাহ্দী এবং মীমাংসাকারী ও ন্যায়-বিচারকরূপে দেখবে" ['মসনদ' ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১১]
এই হাদীসে "লা মাহ্দী ইল্লা ঈসা" ("মসীহ বাদে মাহ্দী নাই") হাদীসের ন্যায় ইমাম মাহ্দী এবং ঈসা ইবনে মরিয়মকে একই ব্যক্তি বলিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং ইমাম মাহ্দীকে অন্যান্য সমস্ত হাদীসেই মুহাম্মদী উম্মতের ব্যক্তি বিশেষ বলা হইয়াছে।
সুতরাং হযরত ঈসা (আলায়হেস্ সালাম)-এর আকাশ হইতে সোজা অবতণের ধারণা ভ্রান্তিমূলক। মুহাম্মদী উম্মতের ইমাম মাহ্দীকেই হাদীসে 'উম্মতের প্রতিশ্রুত ঈসা' (মাওউদ মসীহ) নির্দেশ করা হইয়াছে, যাহাতে ঈসা আলায়হেস্ সালামের সহিত ইমাম মাহ্দীর সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়। (চলবে)

ভাষান্তর : এ, এইচ, এম, আলী আনোয়ার (মরহুম)

করুণা

আল্লাহ্র অসীম করুণা বলে,
ইসলামেরই সুশীতল ছায়াতলে-
নিতে পারলাম ঠাঁই।
লোকে আমায় নিন্দা করুক,
দুঃখ তাতে নাই।
ইসলামেরই মোহন বাঁশী।
হৃদয় আমার উঠলো হাসি।
আল্লাহ্র আদেশ শিরোধার্য জানি
প্রিয় নবীজীর ভবিষ্যদ্বাণী
অন্ধকারে আঘাত হানি
দিল যে আলোর পরশখানি
তাইতো তাঁরে ইমাম মানি।
ধন্য হলো হৃদয় খানি।
ধন্য তুমি মাহদী মীর।
ধন্য তোমার উচ্চ শির।
আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ,
যা কিছু পবিত্র কুরআনে।
তাইতো তুমি দেখিয়ে দিলে,
সারা বিশ্ব জাহানে।
সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত
হলো না যা নির্দশন।
তোমার তরে রাখিল বিধি তা,
একই চান্দ্র মাসে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ।
পৃথিবী জুড়ে এত বড় রাজ্যের উদঘাটন।
আর কোন নবীর তরে, হয়েছে কখন ?
তোমাকে জানার, তোমাকে চেনার, এইতো সহজ পথ
হাজারো নিদর্শন রেখে গো মোরা, নিয়েছি এই শপথ
আল্লাহ্ যারে যুগ-ইমাম করে;
পাঠিয়েছে মোদের দিতে আলোর সন্ধান
আমরা কেন অঞ্জলী ভরে, দানিব না তারে
বিশ্বে রাজ সম্মান।

বেগম জাহানারা রাজা

উটে চড়া নবী চাঁদে চড়া মানুষ

প্রারম্ভিক কথা ঃ

মানুষের বেলায় কেন?

অনেক নবী-রসূলই উটকে যানবাহনরূপে ব্যবহার করেছেন। এখানে আমরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বুঝাচ্ছি। চাঁদেচড়া মানুষ দ্বারা মানুষের চাঁদে যাওয়ার সময় হতে পরবর্তী কালকে বুঝানো হচ্ছে। চৌদ্দ শতাধিক বছর পূর্বেকার নবীর শিক্ষা ও আদর্শ এ যুগের লোকের আদর্শগত চাহিদা মিটাতে পারে কিনা তা-ই হলো আলোচনার মূল লক্ষ্য। বিষয়টিকে সঠিক ও গভীরভাবে উপলব্ধির জন্য কিছু প্রারম্ভিক কথা বলা অত্যাবশ্যক। নবী-রসূল তথা প্রেরিত পুরুষগণ সার্থকভাবে মানবজীবন গড়ার জন্য সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্প্রদত্ত আদর্শ নিয়ে আগমন করেন। এ আদর্শের লক্ষ্য থাকে মানবতার সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ বিকাশ যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, সৃষ্টিতে পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, মাছ-গাছ, জীবাণু প্রভৃতি অসংখ্য রকমের জীবন আছে। ওসবের বেলায়তো ওদের মধ্য হতে কোন নবী-রসূলের শুভাগমন ঘটেছে বলে জানা যায়নি। তবে 'সেরা সৃষ্টি' মানুষের বেলায় কেন এরূপ হয়? ক্রমশঃ এই 'কেন'র উত্তর খোঁজা হবে।

মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্যঃ

অন্যান্য প্রাণীর সাথে তুলনা করলে মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলে শেষ করা সহজ নয়। আলোচনার উদ্দেশ্য সাধরণের জন্য সব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখের প্রয়োজন হবে না। কতকগুলো নিয়ে আলোচনা করলেই উপরোক্ত জিজ্ঞাসার সমাধান পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আদম সন্তানদের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তার মাঝে মহত্ব ও হীনত্বের বীজ রোপিত আছে। কোনটাকে সে বিকশিত ও কোনটাকে নিয়ন্ত্রিত করবে সে স্বাধীনতা এবং সামর্থ্য তাকে দেয়া হয়েছে। এসবের বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য তার প্রয়োজন হয় কোন আদর্শকে ভিত্তি করে অগ্রসর হওয়া। এজন্য বিধি-বিধানও প্রয়োজন হয়। মানুষ নিজে মনমত আদর্শ ও বিধি-বিধান নির্ধারণ করতে পারে, করেও থাকে। অপরটিকে প্রেরিতদের মারফত স্বয়ং স্রষ্টা ও আদর্শ ও বিধি-বিধান দান করে থাকেন যাকে ধর্ম বলা হয়। ধর্মের বিধি-বিধানকে শরীয়ত বলা হয়।

কবে, কখন, কোথায় কার জন্ম হবে, কতটুকু মেধা পাবে, গায়ের রং ও দৈহিক গঠন কীরূপ হবে এসব নির্ধারণের অধিকার মানুষসহ কোন প্রাণীকেই দেয়া হয় নি। তাই এসবের পরিমানগত দিকের জন্য কেউ দায়ী নয়। তবে আমাদের যাকে যতটুকু মেধা তথা চিন্তা-শক্তি জ্ঞান-বিদ্যা বুদ্ধি-বিবেচনা দেয়া হয় এ সবের ব্যবহারের হিসেব-নিকেশ প্রত্যেককেই দিতে হবে, ধর্ম বিভিন্নভাবে সে কথা বার বার জোর দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়।

(ক) সৃষ্টির সেরাঃ

মানুষের মাঝে কেউ ধর্মীয় শিক্ষার ভিত্তিতে কেউবা নিজে নিজেই সৃষ্টির সেরা দাবী করে থাকে। এ দাবীতে যে উপলব্ধির সন্ধান পাওয়া যায় তা খুবই কাম্য ও তাৎপর্যবহ হয়ে দাঁড়ায় যদি এর সাথে দায়িত্ববোধ সক্রিয় থাকে। তা'ছাড়া মানুষের মাঝে হীনত্বের যে বিষবৃক্ষ রোপিত আছে সে সম্পর্কে সাবধান না থাকলে সে কুরআনের ভাষায় (সূরা তীনঃ ৬ আয়াতাংশ) 'নীচাদপি নীচে' চলে যেতে পারে। বস্তুতঃ এরূপ লোক দ্বারাই সমাজে অবক্ষয় বিস্তার লাভ করে, মানবতা ও ইতিহাস কলংকিত হয়। অপরদিকে মহত্বের সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে মানবতা সার্থকতা খুঁজে পায় ও সাথে সাথে সুসমাজ গড়ে ওঠে। এমনকি মানুষ আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হতে পারে। তখনই সৃষ্টির সেরা হওয়ার দাবী বাস্তব রূপ ধারণ করে। মহত্বের পরিপোষণের জন্য পরম করুণাময় ও কুশলি আল্লাহ্ মানুষকে বিবেক দান করেছেন, ফিরিশতাদের মাধ্যমেও সহায়তা দেন। এতদুপরি আদম-সন্তানদের সঠিক পথের সন্ধান দিতে নবী-রসূল পাঠিয়ে থাকেন। হীনত্বকে প্ররোচনা জোগানোর জন্য শয়তানকে নিয়োজিত রেখেছেন। এমনিভাবে তিনি মানুষকে মহা পরীক্ষায় ফেলেছেন। তাই মহত্ব বিকাশের জন্য যেমন মানুষকে সদা সজাগ ও সক্রিয় থাকতে হয় তেমনি হীনত্বকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেও তৎপর থাকতে হয়। বস্তুতঃ এখানেই মানুষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরবে মহিমামন্ডিত হয়।

কুরআনে মানবজীবন সার্থক করার জন্যে প্রয়োজনীয় সব দিক-নির্দেশনা রয়েছে তন্মধ্যে এখানে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াতের (বাংলা তর্জমা) উদ্ধৃতি দেয়া হলোঃ এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের আনুগত্য করিবে তাহারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হইবে যাহাদিগকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করিয়াছেন অর্থাৎ নবীগণ এবং সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ এবং সালেহ্গণের মধ্যে। এবং ইহারাই সঙ্গী হিসাবে উত্তম (৪ঃ৭০)। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে নিষ্ঠার সাথে নির্দেশ পালনকারীগণকে তাদের যোগ্যতা অনুসারে চার প্রকার মর্যাদায় ভূষিত করবেন, আল্লাহ্ এই ঘোষণা দিয়েছেন। বান্দাদের জন্য এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে? আল্লাহ্র এই চিরন্তণ বাণীকে যেন আমরা পাথেয় করি, কখনও ভুলে না যাই।

স্রষ্টার অন্তহীন সৃষ্টির প্রতি নিবিড়ভাবে দৃষ্টি দিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষকে কেন্দ্র করেই যেন এই বিরাট বিশ্বের সব সমারোহ। আল্লাহ্ কুরআনে বলেনঃ (বাংলা তর্জমা) তোমরা দেখ না যে, যাহা কিছু আছে আকাশ সমূহে এবং যাহা কিছু আছে পৃথিবীতে সমস্তই আল্লাহ্ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার বাহ্যিক অভ্যন্তরীণ নেয়ামতসমূহকে সম্পূর্ণ করিয়াছেন (৩১ঃ২১ আয়াতাংশ)। সৃষ্টিতে মানুষের এত উচ্চাসনের কারণ খুঁটিয়ে দেখলে সে সব বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে তাহলোঃ (ক) মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মাঝে প্রবৃত্তিগত পার্থক্য। অন্যান্য প্রাণীর প্রেরণা বা প্রবণতায় (ইংরেজী Instincts বলা হয়) তাতে ভালমন্দের উপস্থিতি আছে বলে বুঝা যায় না। এসবে দূর প্রসারি কোন ইঙ্গিতেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তাদের প্রবণতার ক্ষেত্র সাময়িক, খুবই সীমিত ও পূর্বনির্ধারিত। অপরদিকে মানুষের প্রবৃত্তিকে 'শক্তি' [ইংরেজীতে Capacities] বলা যায়। তাতে ভালমন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। তা যেমন সাময়িক হতে পারে তেমনি তা দূর প্রসারিতও হয়ে থাকে। এসবকে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে কাজে লাগানোর জন্য অনেক বিধি-বিধান কার্যকর এসবের বালাই নেই। কিছু উদাহরণ নিলেই বিষয়টি স্পষ্টতর হবে। যৌনপ্রেরণাকে গঠনমূলক কাজে লাগানোর

জন্য বিবাহ-প্রথা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। জানার প্রবৃত্তিকে বিস্তার দান ও কল্যাণময় করার জন্য কত ধরনের শত শত শিক্ষা প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে তোলা হচ্ছে তা বলে শেষ করা দূরূহ। অন্যান্য প্রাণীর মাঝে এসবের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না। শেয়ালকে 'পন্ডিত' বলা হয়। এ হলো মানুষের দেয়া উপাধি। ওরাতো প্রাইমারি স্কুলও খোলেনি। কখনও তা পারবে বলেও মনে হয় না। তবে পন্ডিত হলো কি করে! 'শেয়াল কুমীরের বাচ্চাদের শিক্ষার ভার নিয়েছিলো' – মানুষেরই বানানো গল্প। প্রবণতা-নির্ভর প্রাণীরা কোন কিছু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা গবেষণা করতে অপারগ। কিন্তু 'শক্তির' অধিকারী মানুষের বেলায় দেখা যায় এসবের উল্টো। এতে বিকাশের বৈচিত্র এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সীমাহীন ক্ষেত্র বিরাজিত। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করতে হচ্ছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এসবকে অনেকে রিপু বলে গণ্য করে থাকে। এটি মনে হয় ভুল ধারণা। এগুলো হলো আমাদের শক্তি সামর্থ্য, প্রকাশের স্বভাবজ রূপ বা মাধ্যম। এগুলো ভালও নয়, মন্দ নয়। সর্বকালেই দেখা যায় এগুলোর সঠিক ব্যবহার আমাদের জন্য অফুরন্ত কল্যাণবহ হয়। অপরদিকে এসবের অপব্যবহার অবক্ষয়ের ইন্ধন রূপে কাজ করে থাকে। ফলে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাজারো অগ্রগতি এ সত্যের কোনই ব্যতিক্রম ঘটাতে পারেনি, কখনও পারবে বলেও মনে হয় না। রুশো কি চমৎকারভাবে বলেছেনঃ বিবেক হলো আত্মার স্বর আর রিপু হলো দেহের ভাষা, আত্মার স্বরকে 'আত্মীয়' করে নিলেই দেহের ভাষাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। (চলবে)

– মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

আমি কেন আহমদী হলাম

স্নাতক পরীক্ষা শেষে চাকুরীর উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম যাই। পূর্ব পরিচিত এলাকা হিসাবে হালিশহর বিশ্ব গোডাউনের নিকট জনাব আবদুল্লাহ্ চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ীতে লজিং থাকি। অল্প সময়ে চাকরী পেয়ে গেলাম। ১৯৭৯ ইং সনে ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে এক আহমদী ভাইয়ের বাড়ী বেড়াতে আসি। আহমদী ভাইয়ের ঘরে ধর্মীয় অনেক পুস্তকাদি দেখতে পাই। আমি ছোট বেলা হতে নামায পড়তাম এবং ধর্মের বিষয় অনুরাগী থাকায় বইগুলো পড়তে থাকি। বেড়ানোর মুহূর্তে একদিন আহমদী ভাই আমাকে প্রশ্ন করলেন, হযরত ঈসা (আঃ) নবী সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? আমি কাল বিলম্ব না করে উত্তর দিলাম তিনিতো চতুর্থ আসমানে আছেন, কেয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতে আসবেন। আহমদী ভাইটি বললেন, এই কথা আপনি কোথায় পেয়েছেন? আমি বললাম, কেন হুযুররাতো বলেন। তিনি বললেন, এই কথাগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

আহমদী ভাই আমাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বলুনতো হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে আপনার কী ধারণা ? আমার একই জবাব, কেয়ামতের পূর্বে তিনি আসবেন এবং ইসলামের শত্রুদের বধ করবেন ইত্যাদি। তিনি বললেন, এ ধারণাও আপনার ঠিক নয়। এই ধরুন হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে বই এবং ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের খবর। আমাকে দু'টি পুস্তক দিলেন। আমি তার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম ও চিন্তা করতে লাগলাম, কারণ আমি ধর্মীয় বিষয়ে অজ্ঞ। তাই তর্কে না যেয়ে বইগুলো সযত্নে ব্যাগে পুরলাম। শুক্রবার জুমুআর নামায আহমদীয়া মসজিদে আদায় করতে যেয়ে আরও বিভ্রান্তির মধ্যে পড়লাম ; কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দিলাম যে, আগে আমাকে জানতে হবে তারপর তর্ক। এরপর চট্টগ্রাম চলে এলাম।

চট্টগ্রাম কর্মস্থলে এসে কর্মের ফাঁকে বইগুলো যতই পড়ি আমার মনে ততই সন্দেহের দানা বাঁধে। ঠিক করলাম মসজিদের ইমাম সাহেবের নিকট বই দু'টি নিয়ে যাব, তিনি হয়তো আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিবেন।

একদিন জুমুআর নামাযের পর বড় পুল বড় মসজিদের ইমাম সাহেবকে বই দু'টি দেখিয়ে বললাম, হুযূর এই বই দু'টিতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন বার্তা ও হযরত ঈসা (আঃ) নবীর মৃত্যু সম্পর্কে তথ্য দেয়া আছে। আমি বিষয়টি বুঝছি না, আমাকে একটু বুঝিয়ে দিবেন। ততক্ষণাৎ মসজিদের ইমাম সাহেব আমাকে বললেন যে "ওবা মাষ্টোর, **ইবা কাদিয়ানী বই না?** আমি বললাম, না, এটা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার লেখা বই। তিনি বললেন, **"ইতারাই কাদিয়ানী" অয়নে এই বই ন ফজ্জন, এই বই ফড়িলে কাফের হইয়া যাবা গই।"** এই কথা বলে ইমাম সাহেব দ্রুতবেগে নিজের কর্মে চলে গেলেন। আমি শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকলাম কারণ বেশী বাড়ালে না জানি হুযূরের সাথে বেয়াদবি হয় কিনা এবং আমার পাপ হয়। আমার পাশেই দাঁড়ানো পঞ্চাশোর্ধ বয়স্ক মোয়ায্যেন সাহেব মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছেন। আমি তখন মোয়ায্যেন সাহেবকে জিজ্ঞেস করি, মোয়ায্যেন সাহেব ব্যাপার কি? হুযূর বললেন, এই বই পড়লে কাফের হবো আর আপনি মুচ্‌কি হাসছেন? তখন মোয়ায্যেন সাহেব বললেন যে, **"মাষ্টোর এই বইয়ত যা লেখকেদে ব্যক হ্যেচা কতা"** এ্যাতে ব্যক কোরান হাদীসের রেফারেঞ্জ দিয়েছে। ইতারা ব্যক হ্যাচা কতা কইয়েদে"। তখন আমি বললাম, তাহলে আপনারা মানেন না কেন? মোয়ায্যেন সাহেব বলেন, **"আমারা ন মানতে পারিরদে প্যাডের লাই"**। আমি তখন বললাম যে, তাহলে আমাকে তো এই বই পড়তে হবে ও মানতে হবে একজন মুসলিম হিসাবে।

তারপর আমার আপন আত্মীয় মাওলানা পাশ তার কাছে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের এখনো সময় হয় নি। তিনি আমাকে কিছু আজগুবী গল্প শুনালেন যার কোন ভিত্তি নেই। আমার মনকে স্থির রাখতে পারলাম না। ১৯৮০ সনে ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে আমি সেই পুরাতন বন্ধুর বাড়ীতে উঠি। সিদ্ধান্ত নিলাম চাকুরী আর করব না এখানে ব্যবসা করব আর আহমদীয়ত সম্পর্কে আরও ভাল করে জানব। প্রকৃত ইসলামের তথা আহমদীয়তের আলো ধীরে ধীরে আমার হৃদয়ে ঢুকতে লাগলো এবং আমার জীবনের পিছনের ইসলাম অতি দ্রুত বেগে আমার হৃদয় হতে চলে যেতে লাগলো। আমি পেলাম ইসলামের নূতন এক জীবন। ঐ সালেই জুলাই মাসে আমি দীক্ষা গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতে দাখিল হই। অদ্যাবধি আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে সম্মানের সাথে পরিবার নিয়ে জীবন-যাপন ও জামাতের খেদমত করার তৌফীক দান করেছেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। সবার নিকট দোয়াপ্রার্থী আল্লাহ্ যেন আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এবং আমার বংশধর যেন কেয়ামত পর্যন্ত আহমদীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, আমীন।

–শেখ মোশারফ হোসেন

বয়াত গ্রহণকারীদের খেদমতে কিছুকথা

বয়াতের উদ্দেশ্য ঃ

বয়াত গ্রহণের সেলসেলা প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য হ'লো মুত্তাকীনদের একটি জামাত গঠন করা। এদের নেক আত্মা জগদ্বাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাদের ঐক্যবদ্ধতা ইসলামের জন্য বরকত, আযমত, গৌরব এবং কল্যাণময় ফলোদয়ের কারণ হয়। এদের সম্পর্কে এ যুগের সংস্কারক হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) বলেন, – "হে মু'মিন ভ্রাতাগণ! আপনারা সকলেই, যাঁহারা ঐকান্তিকরূপে আল্লাহ্‌কে পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই অধমের নিকট বয়াত গ্রহণের আকাঙ্খা রাখেন, বিশদরূপে অবহিত হউন যে, মহিমান্বিত ও মহানুভব প্রতিপালক-প্রভু যিনি আকাঙ্খা করিয়াছেন যে, বিভিন্ন প্রকারের মতভেদ, অনৈক্য, মনোমালিন্য, হিংসা-বিদ্বেষ, বিবাদ-বিসম্বাদ ও ফাসাদ যা-কিনা মুসলমানদিগকে বেবরকত ও অকর্মণ্য ও দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে – এইসব হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া 'ফা আসবাহ্‌তুম বে- নেমাতেহী ইখওয়ানা' (আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে তাঁহারই নে'মতস্বরূপ তোমরা পরস্পর ভাই-ভাই হইয়া গেলে) আয়াতের প্রতীক হিসাবে গড়িয়া তুলিতে চাহেন। "তারা দিবা-রাত্রি তস্‌বীহ করে এবং তারা কখনও অবসন্ন হয় না"। "বয়াত গ্রহণের পর তারা যেন শিথিল, ক্লান্ত-শ্রান্ত, কৃপণ,অকর্মণ্য ও অকেজো মুসলমানবৎ না হয়। ঐ সকল অযোগ্য ও অপদার্থ লোকদের মত না হন যারা নিজেদের বিভেদ ও অনৈক্যের কারণবশতঃ ইসলামের ভয়ংকর ক্ষতি সাধন করেছে এবং এর সুন্দর ও মনোরম চেহারাকে নিজেদের অবাধ্যতা ও পাপাচার পূর্ণ অবস্থাবলীর দ্বারা কলংকিত করেছে। তেমনি তারা যেন ঐরূপ গাফিল, অচেতন ও উদাসীন দরবেশ ও নিভৃত কোণঘেঁষা লোকদের ন্যায়ও না হন, যারা ইসলামী জরুরত ও প্রয়োজনে কোন খোঁজ খবরই রাখেন না।

বয়াতের তাৎপর্য ঃ

'বয়াত' কথাটি 'বায়'উন' শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে। 'বায়'উন' সেই দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিকে বলে, যদ্বারা একে অন্যকে কোন দ্রব্যের বিনিময়ে কোন দ্রব্য দিয়ে থাকে। সুতরাং বয়াত শব্দের তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি বয়াত করে সে আপন হৃদয়কে তার সমস্ত অধিকারসহ একজন পথ-প্রদর্শকের হাতে এতোদ্দেশ্যে বিক্রয় করে যেন সে তার বিনিময়ে এমন পূর্ণতত্ত্ব ও কল্যাণলাভে সক্ষম হয় যদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান, নাজাত এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ ঘটে। বয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ আপন সত্তাকে পথ-প্রদর্শকের আনুগত্যে নিয়োজিত করে সেই তত্ত্ব-জ্ঞান ও কল্যাণ লাভ করে যদ্বারা ঈমান সুদৃঢ় হয় এবং জ্ঞান-বৃদ্ধি ঘটে এবং আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে এক অনাবিল সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এইরূপে মানুষ পার্থিব জাহান্নাম হতে মুক্তিলাভ করে পারলৌকিক জাহান্নাম হতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় এবং পার্থিব দৃষ্টিহীনতা হতে আরোগ্যলাভ করে আখেরাতের দৃষ্টিহীনতা হতেও নিরাপদ হয়।

পবিত্র কুরআনে বয়াতের কথা ঃ

সূরা তওবার ১১১ নং আয়াতে বয়াত গ্রহণের কথা এসেছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে –

"নিশ্চয় আল্লাহ্ মোমেনগণের নিকট হইতে তাহাদের জীবন এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ক্রয় করিয়া নিয়াছেন। অতএব তোমরা এই বেচাকেনায় খুশী হও, যে বেচাকেনা তোমরা তাঁহার সাথে করিয়াছ।"

অন্যত্র একই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

"নিশ্চয় যাহারা তোমার নিকট বয়াত করে প্রকৃতপক্ষে তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট বয়াত করে।"

আগমনকারী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর হাতে বয়াত গ্রহণের তাকিদ

আঁ হযরত (সাঃ) আখেরী জামানায় আগমনকারী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর হাতে বয়াত গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেনঃ

"যখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে তাঁর হাতে বয়াত করিও, যদি বরফের উপর হামাগুঁড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল্ মাহদী।"

এ ছাড়া আবারও বলা হয়েছে ঃ

আল্লাহ্‌তাআলার খলীফা ইমাম মাহদী আসবেন, তোমরা তার আগমন-বার্তা শুনামাত্রই তার নিকট হাযির হয়ে বয়াত করবে।

সহী মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে – "যে ব্যক্তি যামানার ইমামের হাতে বয়াত না করে মারা যাবে, সে জাহেলিয়তের মৃত্যুবরণ করেছে।"

বয়াতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তওবা

"আমি আমার প্রভু আল্লাহ্‌তাআলার নিকট সমুদয় পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁরই সমীপে তওবা করি।"

তওবা অর্থ রুজু বা প্রত্যাবর্তন। সুতরাং তওবা বলতে এই অবস্থাকে বুঝায় যে, মানুষ তার যে সকল পাপে অধিকভাবে জড়িয়ে পড়ে যেগুলোকে সে তার ওয়াতান বা আবাসভূমিস্বরূপ নির্দিষ্ট করে ফেলে যেন সে পাপের মধ্যেই বসবাস স্থাপন করে নিয়েছে। তওবার অর্থ হলো – সেই ওয়াতানকে পরিহার করা এবং রুজু অর্থ পবিত্রতা অর্জন করা। ওয়াতান পরিত্যাগ করা বড়ই দুরূহ ও কষ্টদায়ক হয়ে থাকে এবং শত প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। একটি গৃহ যখন মানুষ ছেড়ে যায়, তখন কতই না তার দুঃখ হয়। আর নিজ ওয়াতন (জন্মভূমি) ছেড়ে যাওয়াতে তো তাকে সকল বন্ধু-বান্ধব হতে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার সব কিছু ছেড়ে যেতে হয়। এক নূতন দেশে তাকে যেতে হয় অর্থাৎ সেই পুরাতন আবাস ভূমিতে সে আর কখনও ফিরে আসে না। এর নামই তওবা।

বয়াতে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়

বয়াতে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। এর দ্বারা ঈমানের মূল দৃঢ় হয়।

কুরআন শরীফে ইহা দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক: নিজ হৃদয়কে খোদার প্রেমে শক্তিশালী করে পাপের প্রকাশকে বাধা দেওয়া। দুই: পাপ হতে বের হয়ে খোদাতাআলার দিকে ধাবিত হওয়া; যেমন বৃক্ষ মাটিতে লেগে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পবিত্র পরিপুষ্টি লাভ করে এবং পাপের শুষ্কতা ও অধঃপতন হতে রক্ষা পায়। ইস্তেগফার 'গাফারা' শব্দ হতে উদ্ভূত। এর অর্থ ঢেকে দেয়া এবং গেড়ে দেয়া। এ মতে ইস্তগফারের উদ্দেশ্য হ'লো যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রেমে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, আল্লাহ্‌তাআলা যেন তার পাপ চেপে দেন। পরন্তু ঐশী চাদরে আচ্ছাদিত ক'রে তাকে স্বীয় পবিত্রতার আশিস দেন অথবা কোন শিকড় পাপের দ্বারা নগ্ন হলে উহা ঢেকে দেন এবং নগ্নতার অনিষ্ট হতে রক্ষা করেন। বৃক্ষ যেমন মাটির মধ্যে নিজ শিকড় গাড়তে থাকে, যেন মাটি হতে ইহা বিচ্ছিন্ন হয়ে শুকিয়ে না যায়। এরপর ঐ শিকড়ের সাহায্যে মাটির রস টানতে থাকে এবং এভাবে ঐ বৃক্ষ বাড়তে থাকে। আল্লাহ্‌তাআলা একই বিধান মানুষের জন্য রেখেছেন – প্রথমতঃ সে সততা ও দৃঢ়তার সাথে খোদাতাআলার মধ্যে নিজ সত্তাকে মজবুতভাবে নিবদ্ধ করে। ক্ষমা প্রার্থনার সাহায্যে নিজ শিকড়কে খোদার প্রেমে প্রোথিত করে এবং এরপর বাক্যে-কার্যে তওবার মাধ্যমে খোদার দিকে বিনত হয়। বিনয় ও নম্রতার ঝরণা দিয়ে আপন প্রভুর করুণাবারি আকর্ষণ করে এবং উক্ত পানি দ্বারা পাপের শুষ্কতা প্লাবিত করে ফেলে এবং দুর্বলতাকে দূর করে: তখন তাদের মধ্যে কোন অবসাদ, ক্লান্তি আসে না। দিন রাত তারা তস্‌বীহ ও আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করে।

অতএব বয়াত গ্রহণের সঙ্গে ধীরে ধীরে হলেও আমাদের মধ্যে যেন এ চিহ্নগুলো প্রকাশ পায়ঃ

(১) ক্ষণস্থায়ী আকস্মিক ভাবাবেগে যেন এ যুগের মাহদী (আঃ)-কে গ্রহণ না করি। কষ্ট ও বঞ্চনার চাপের মুখে যেন আমরা নিরুৎসাহিত না হই।

(২) সকল বাধা-বিপত্তির মুখেও ঈমানে অটল থাকি। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বাধা-বিপত্তিকে যেন অতিক্রম করতে পারি।

(৩) উৎসাহ ও উদ্যমসহ সত্যের খেদমতে কখনও নিস্তেজ না হই।

(৪) ইবাদতে ও মানুষের সেবায় যেন ক্লান্ত না হই। আল্লাহ্‌র ইবাদতে সর্বদা আমাদের নিকট যেন স্ফূর্তির উৎস হয়।

বয়াত গ্রহণের পর যারা জামাতে আহমদীয়ার সদস্য হয় তারা যেন নিম্নের ৩টি পর্যায় পার হয়ঃ-

প্রথম পর্যায় ঃ এ পর্যায়ে বিশ্বাসীকে নিজের কুপ্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তিকে পরাভূত করার জন্য ভীষণ যুদ্ধ করতে হয় এবং সর্ব প্রকার স্বার্থত্যাগ করতে হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ এই পর্যায়ে বিশ্বাসীকে তার গন্তব্য পথের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হয় এবং ক্রমান্বয়ে গতিবৃদ্ধি করতে হয়।

তৃতীয় পর্যায় ঃ এই পর্যায়ে আত্মত্যাগ ও প্রবৃত্তি দমন তার স্বভাবের অঙ্গ হয়ে পড়ে এবং নৈতিক উন্নতির চরমস্তরে পৌছে। এখান হতে জীবনের সর্বোচ্চ মার্গে উপনীত হবার চেষ্টা ও গতি তীব্রতর ও বিরামহীন হয়ে পড়ে।

বয়াতগ্রহণকারী বিশ্বাসীদেরকে তখন ৫টি দলে প্রকাশ পেতে দেখা যায়ঃ

(১) **নাযেয়াত** – এ দলটি অন্যদেরকে সত্যের দিকে আকর্ষণ করে।

(২) **নাশেতাত** – এ দলটি স্বীয় কর্তব্য পালনে মনে প্রাণে চেষ্টিত থাকে।

(৩) **সাবেহাত** – এ দলটি তাদের কাজের (works) জন্য দেশের প্রান্ত পর্যন্ত চলে যায়।

(৪) **সাবেকাত** – এরা নিজেদের উদ্দিষ্ট পথে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

(৫) **মুদাব্বেরাত** – এ দলটি অতিশয় দক্ষতার সাথে তাদের উপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং বাস্তবায়নের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করে থাকে।

অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ

এ জলসায় যাঁরা আকিকা দিচ্ছেন তাঁদের সকলের জন্যে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে

(৮-২-৯৮ পর্যন্ত প্রাপ্ত নামের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো)

১। পিতা – মীর হাসান আলী (নিয়াজ)
মাতা – মিসেস জিন্নাতুন নাহার
সন্তান – মীর শাব্বির আহমদ*

২। পিতা – জনাব মসিউর রহমান
মাতা – মিসেস মাহমুদা কায়সার
সন্তান – মুসাদ্দেকুর রহমান*

৩। পিতা – সৈয়্যদ সরফরাজ আহমদ
মাতা – মিসেস সেহলা সুরাইয়া
সন্তান – সৈয়্যদা সামিহা নুদার (ওয়াকফে নও)
(জন্ম তারিখ ১০-১২-৯৫)

৪। পিতা – জনাব খালেদুর রহমান ভূঁইয়া
সন্তান – মতিউর রহমান ভূঁইয়া
সন্তান – রাহিমা কাজল
সন্তান – সাজিমা কাজল

৫। পিতা – জনাব এস এম তারেক ইকবাল
সন্তান – এস এম আনিস
সন্তান – এস এম তারিফ
সন্তান – এস এম তৌসিফ

৬। পিতা – জনাব এনায়েত উল্লাহ সিকদার
সন্তান – এস এম তানভীর কামাল

৭। পিতা – জনাব খন্দকার কবির উদ্দিন আহমদ
মাতা – মিসেস মোহসেনা পরশ
সন্তান – খন্দকার সালেহা মরিয়ম

* যথাক্রমে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পৌত্র ও দৌহিত্র

সূচনা রেন্ট–এ–কার
যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য
সালমান
অস্থায়ী অফিস : ৬৭৬/৩২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা
ফোন : ৯১২০৫৯৭, ৩১৮৭৪৯

আহমদীয়তের সত্যতার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন

যুগে যুগে যারা সত্য গ্রহণ করেছেন এবং তার প্রসারকল্পে কার্য করেছেন, তাদের উপর অত্যাচার যুলুম ও নির্যাতনের চরম প্রকাশ ঘটেছে। আহমদীয়তের সত্যতার প্রচারকারীদের উপর আজও অত্যাচারী ধর্মান্ধদের খড়্গ-কৃপাণ নেমে আসে।

গত বছর ৮ ফেব্রুয়ারী হতে আমাদের সাথে গ্রামের লোকদের উদ্যোগে মোখালেফাতের আয়োজন করা হয়। এরই জের ধরে মোখালেফগণ আমাদের আহমদীয়ত ত্যাগ করানোর জন্য ১৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সভা করে। এতে আব্বাকে আহমদীয়ত ত্যাগের জন্য তাকিদ দেয়। আব্বা আহমদীয়তের সত্যতা ও নিজের দৃঢ়তার কথা জানালে গ্রামের লোকেরা আমাদের মারপিট করার জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং সিদ্ধান্ত করে যদি ওরা আমাদের রোববারের মধ্যে গ্রাম ছাড়া করতে না পারে তবে ওরা তাদের মায়ের সাথে ব্যভিচার করবে। ১৭ তারিখ রোববার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেবকে নিয়ে যথা সময়ে সভা হয়, আমাদের গ্রাম ত্যাগ করানোর জন্য। এলাকায় লোকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দাদা ও চাচাদের ১০ টাকার স্টাম্পে দস্তখত নেয়া হয় আমাদের উপর কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় ৫ এপ্রিল শুক্রবার সমস্ত জেলাব্যাপী এক প্রতিবাদ সভা হবে এবং এতে আমাদেরকে উপস্থিত করে যা ইচ্ছা তা করবে। আয়োজন এতই ভয়াবহ যে মোখালেফগণ সমস্ত এলাকার মসজিদ, মাদ্রাসা, গ্রাম্য লোক সবাইকে উক্ত সভায় থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানায়, এমনকি এক পর্যায়ে কয়েক হাজার লোকের সমাবিষ্ট ষাঁড়ের লড়াইয়ের মধ্যে গিয়ে সুনামগন্জ জেলাব্যাপী পরিচিত মৌলভী আব্দুল হক জনগণকে প্রতিবাদ সভায় অংশগ্রহণ করে ঈমানী দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান করে। মৌলভীদের সাথে যোগ দিয়ে দাদাও আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন। আমাদের ধ্বংসের জন্য সব রকমের আয়োজন চূড়ান্ত। এরই মধ্যে ঘটে যায় এক কান্ড। আমার দাদা ও চাচা যিনি স্টাম্পে সই করেছিলেন তারা আত্মঘাতি ষড়যন্ত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

প্রতিবাদ সভার সময় নিকটে চলে আসতে থাকে। পরিস্থিতি এতই ভয়াবহ যে, আমার দাদা নিজ পাকাবাড়ী ফেলে পাশের বাড়ীতে আশ্রয় নেন এবং বলেন – আমরা বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার পর তিনি আসবেন। দাদার উদ্দেশ্য– আমরা যেন আহমদীয়ত ছেড়ে দিই। সব রকমের আয়োজন পাকা। মোখালেফাতের ঢেউয়ে আকাশ বাতাস কম্পিত। চার দিক হতে ভেসে আসছে আতংকের সুর। কাজেই শেষবারের মত গ্রামের লোকেরা আসে ৫ তারিখ সভায় আমাদেরকে উপস্থিত থাকার কথা বলতে। আমরা প্রতিবাদ সভায় থাকব না বললে জনৈক আচির আলী আব্বাকে বলপূর্বক ঘর হতে ধরে নিবে বলে ঘোষণা দেয়। আব্বা তাকে বিনয়ের সাথে বুঝাতে চাইলে সে কিছুতেই বুঝতে চাইল না বরং খৃষ্টান, কাফের ইত্যাদি গালি দিয়ে চলে যায়। পরদিন শুক্রবার, মাত্র একটি রাত সামনে। এই পরিস্থিতিতে মনে হয় শিয়াল, শকুন ও কুকুর তৈরী, আমাদের লাশ চিবানোর জন্য। আমাদের ভয়ংকর শাস্তি দেবে এই ভেবে এলাকাবাসী আনন্দে উল্লসিত। চারদিকে মাইকের আওয়াজ। প্রতিবাদ সভায় লোকেরা দলে দলে আসছে আমাদের শেষ বারের মত দেখার উদ্দেশ্যে। ভয়ার্ত দৃশ্যের উপস্থাপনের মাধ্যমে অনেকেই উপদেশ দিচ্ছে আহমদীয়ত ছেড়ে দেয়ার। সেই দিন আমাদের দৃঢ়তার উৎস ছিল কুরআনের এই আয়াত–

"খোদাতাআলা আমাদিগের জন্য যাহা লিখিয়াছেন তাহা ব্যতীত অন্য কোন বিপদ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি আমাদের একমাত্র কার্য নির্বাহক ও অভিভাবক। শুধু তাহারই উপর মু'মিনদের ভরসা করা উচিত (সূরা তওবা: ৫১)– এর উপর ভিত্তি করে খোদাতাআলার স্মরণের মাধ্যমে কাটছে দিনগুলো। কুরআন পাঠ ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়াগুলো আমাদের তসবীহ হয়ে যায়। তাহাজ্জুদের নামায পড়ার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকি। একটি রাত মাত্র বাকী। কাজেই আমরা তৃপ্তি ভরে শেষবারের মত খোদাকে ডাকি। শুক্রবার চলে এল – ভোর হতেই জঙ্গী মিছিলসহ লোকে লোকারণ্য। সিংহের মত বিকট আওয়াজে আকাশ-বাতাস কম্পিত। আমি আমাদের সবাইকে দৃঢ়তা অর্জনের জন্য মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সেই কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দিই।

"একদিকে স্বীয় বন্ধুগণের বিরুদ্ধে তিনি শত্রুগণকে কুকুরের মত লেলাইয়া দেন, অপর দিকে তাদের খেদমত করিবার জন্য ফিরিশতাগণকে আদেশ দেন। অনুরূপভাবে দুনিয়াতে যখন তাহার গযব আপতিত হয় এবং যালেমদের প্রতি তাহার কোপ উত্তেজিত হইয়া উঠে তখন তাঁহার কোপ দৃষ্টি আপন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের হেফাযত করিয়া থাকি। যদি এইরূপ না হইত তাহা হইলে সাধু ব্যক্তিগণের সকল সাধনা বিনষ্ট হইয়া যাইত এবং কেহই তাহাদিগকে চিনিতে পারিত না।"(কিশতিয়ে নূহ-১২)।

লোকের সমাগমে ভরে যায় মাঠ। ধ্বংসাত্মক প্রোগ্রামের সিদ্ধান্ত নিতে বেজে যায় বিকেল ২টা। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব সহ প্রায় ১০ জন লোক পাঠানো হল আমাদের সভাতে নেয়ার জন্যে। আমরা পূর্বের মত জবাব দিই এতে অনেকেই ক্ষেপে উঠে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় জবাবের মুখে ওরা এখানে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয় এবং সভায় গিয়ে উপযুক্ত জবাব দিবে এই ধমক দিয়ে চলে যায়। এত বড় মোখালেফাত তবু আমরা প্রেসিডেন্ট সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী প্রশাসনকে জানাইনি। কারণ পূর্বে একবার ১৯৮৮ সালে এই মোল্লারা অভিযোগ করেছিল প্রশাসন আমাদের রক্ষা করেছে। নইলে আমাদের একেবারে ধ্বংস করে ফেলতো। কাজেই খোদাতাআলা যে মানুষকে রক্ষা করেন এর প্রমাণ করার জন্যই আমরা প্রশাসনকে জানাইনি। এইরূপ পরিস্থিতিতে মৌলভী আব্দুল হক ১৫টি গ্রামের লোক নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে এবং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমার দাদাকে বাধ্য করে। আমাদের ত্যাজ্য পুত্র করার আদেশ দেয়া হয় এবং ৬ এপ্রিল সূর্য অস্ত যাবার পূর্বেই গ্রাম

ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। ঘোষণা করা হয় যদি আমরা চলে না যাই তবে উক্ত কমিটি আমাদের যে কোন উপায়ে গ্রাম ছাড়া করবে এবং ৭ তারিখ আমাদের কী করা হল বড় মৌলভীকে জবাবদিহি করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে জনৈক চেয়ারম্যান সাহেব সহ মৌলভী গোলাম নবী বেশ কয়েকজনকে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে আসে এবং আমাদের জানিয়ে যায় আগামী কাল সূর্য অস্ত যাবার পূর্বেই চলে যেতে হবে। নইলে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এত কঠোর হৃদয় তাদের বলার ভঙ্গীতে মনে হচ্ছিল প্রাণ দেহ থেকে টপ্‌কে পড়ে যাবে। আমি দৃঢ়তার সাথে তাদেরকে আল্‌হামদুলিল্লাহ্ বলে বিদায় করে দিই। আমরা সিদ্ধান্ত করি প্রাণ দেব তবু আহমদীয়ত কিদিরপুরে টিকিয়ে রাখব। সন্ধ্যা অতিবাহিত হয়। আমরা বাড়ীতেই আছি। কাজেই মোখালেফরা জরুরী সভা করে এবং অনেক আলোচনার পর রাত ৩ টায় সিদ্ধান্ত হয় আমাদের ধরে নেয়ার। এই উদ্দেশ্যে অনেক লোক জঙ্গী মিছিল সহকারে আমাদের বাড়ীর দিকে আসতে থাকে। ভয় ও আতংকে আমরা অস্থির। রাতের অন্ধকারে কে জানে কি ঘটে যায়! আমরা সবাই খোদাতাআলার সাহায্যের জন্য দোয়া করতে থাকি। বৃষ্টির জন্য আবেদন করি, শত্রুরা আমাদের বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করেই দরজা জানালায় বৃষ্টির মত পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে এবং দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করার পরামর্শ করে। আল্লাহ্‌তাআলার অপার অনুগ্রহ ঠিক এই সময় প্রবল গতিতে বৃষ্টি ও ঝড় আসে। ঝড়ের গতি এতই তীব্র ছিল যে, শত্রুরা পাশের বাড়ীতে আশ্রয় নেয় এবং লোক পাঠিয়ে আমাদের জানানো হয় রাত শেষ হবার পূর্বেই আমরা যেন অন্যত্র কোথাও চলে যাই। নইলে দিনে আমাদের যবাই করা হবে। আর আমরা যদি কোথাও চলে যেতে চাই তবে যাবার ব্যবস্থা করা হবে।

এইরূপ পরিস্থিতিতে আমরা জরুরী আলোচনা করি এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খোদাতাআলার কাছে দোয়া করে আব্বাকে প্রেসিডেন্ট সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য রাত ৪.১৫ মিনিটে প্রবল ঝড়ের মধ্যে ঘরের পেছন দরজা দিয়ে পাঠিয়ে দিই।

এরই মধ্যে ঘটে যায় কিদিরপুরের মাটিতে খোদার এক জ্বলন্ত নিদর্শন। সেই আচির আলী শনিবার বাজার থেকে নূতন পাঞ্জাবী ও টুপি কিনে মৌলভী আব্দুল হকের কাছে বয়াত করবে। সারা গ্রামের সবার জানা জানি হয়ে যায় তার বয়াতের কথা। বয়াত করে পাপ মোচন করবে। তাই মৌলভী সাহেবের আস্থা লাভের উদ্দেশ্যে সে চালায় আমাদের উপর অত্যাচারের তুমুল মাত্রা। এই উদ্দেশ্যে রাতের মিছিলে সে আসে এবং মিছিলের স্লোগানগুলো বলে দেয়। বলে দেয় আমাদের চামড়া তোলার বাণী। বৃষ্টি অবস্থা পালটিয়ে দেয়। কাজেই সে বাড়ীতে চলে যায়, গ্রামের যুবকরা জড় হয় তার বাড়ীতে এবং বায়না ধরে আগামীকাল আপনি বয়াত করবেন কাজেই আমাদের শেষ বারের মত গান শুনাতে হবে। আনন্দ ও উল্লাসের সাথে চলে গানের আসর। রাত ৪টার পর সবাই চলে যায়। আযানের পর পর চলে আমাদের ফসলাদি লুটপাট। আচির আলীর এক ছেলে আমাদের নূতন একটি চারা গাছের পেঁপে লুট করে আনন্দ উল্লাসে চলে যায় বাড়ীতে। হয়তো সে জানত না তার আনন্দের শেষ কোথায়। দরজা খোলার জন্য পিতাকে ডাক দেয়। কিন্তু ঘর হতে কোন শব্দ আসেনি। শেষ চেষ্টায় দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে দেখে তার সেই বীর পিতার বীরত্ব আর নেই – খোদার ফিরিশতা তার পিতার ঘাড় মট্‌কিয়ে লাশটিকে লোহার শিকের মত শক্ত করে রেখে যায়। পাড়ার সবাই আতংকিত তার এই ভয়ংকর মৃত্যুতে। বিরুদ্ধবাদীদের অনেকেই এই ঘটনাকে খোদাতাআলার গযব বলে মনে করে। কারণ তার মৃত্যু ছিল সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। মিথ্যাবাদীদের উপর খোদাতাআলার গযব এমনই হয়ে থাকে।

এই সম্পর্কে মসীহ মাওউদের (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী হলো– "স্মরণ রাখিও, খোদা তরবারীর মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি তাহার ধর্মকে ঐশী নিদর্শন দ্বারা জগতে বিস্তার করিবেন এবং কেহই তাহা রোধ করিতে পারিবে না"(কিশ্‌তিয়ে নূহ –৯৩পৃ:)।

তিনি অন্যত্র বলেছেন – "আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবশূন্য পাইতেছি সেই এক এবং অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সহ্য করিয়া গিয়াছেন, এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিবেন"।

উল্লেখ্য লুটের পর পরই লুটকারী আরো একটি ছেলের হাত ফুলে যায় এতে তার মা এসে আমাদের কাছে ক্ষমা চায়। আর আমার শ্রদ্ধাভাজন দাদা সেই কবে যে ঘর ছাড়লেন কোন রকম বাধা না থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ঘরে আসতে পারলেন না।

এই সম্পর্কে আল্লাহ্‌র চিরন্তন বাণী হলো:- "ফাইন্না হিজবাল্লাহি হুমুল গালিবুন – "নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দল এমন যে, তাহারাই বিজয়ী হইবে"।

এই যুগে এইরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম যারা তাঁকে চিনে এবং তাঁর বিস্ময়কর শক্তির উপর বিশ্বাস রাখে।

শাহ নজির আহমদ, (কিদিরপুরী)

আমাদের সার্বিক সফলতার জন্য আপনার দোয়াপ্রার্থী

ফজলে ওমর এন্টারপ্রাইজ

অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে কয়েকজন আহ্‌মদী যুবক কর্তৃক ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি অনন্য যৌথ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান

বদরুদ্দীন মার্কেট, ৩য় তলা, ৪৬, কাটা পাহাড় লেইন, টেরী বাজার, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."

FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE

FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION
36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

উপরে ঃ নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ মোহতারম মাওলানা সুলতান মাহ্মুদ আনোয়ার মজলিসে শূরা-৯৭-এ আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলীর আমীর পদে হুযূর (আইঃ)-এর অনুমোদনের কথা ঘোষণা করেন এবং মঞ্চে ডেকে নেন। পাশে প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী।

মাঝে ঃ মজলিসে শূরা-৯৭ এ উপস্থিত মাননীয় সদস্যগণের একাংশ। সভাপতিত্ব করছেন নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ মোহতারম মাওলানা সুলতান মাহ্মুদ আনোয়ার।

ডানে ঃ নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ মোহতারম মাওলানা সুলতান মাহ্মুদ আনোয়ারকে এমটিএ (MTA) বাংলাদেশ-এর স্টুডিওতে নতুন ক্যামেরার উদ্বোধন করতে দেখা যাচ্ছে। পাশে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর।

ডানেঃ ১৯৯৭ সনে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরায় নির্বাচিত মজলিসে আমেলার সাথে নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ মোহতারম মাওলানা সুলতান মাহ্মুদ আনোয়ার ও ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী।

উপরে ঃ (বামে) মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ-এর ২০তম বার্ষিক ইজতেমায় মোহতরম ন্যাশনাল আমীরকে ভাষণ দিতে দেখা যাচ্ছে এবং (ডানে) তিনি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন।

বামে ঃ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর ২৬তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পাশে হুযুরের (আইঃ) প্রতিনিধি মাওলানা ফিরোজ আলম এবং সদর মজলিস ডাঃ মুহম্মদ সেলিম খান।

ডানে ঃ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর মজলিসে আমেলার সাথে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী এবং হুযুর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মাওলানা ফিরোজ আলম।

বামে ঃ প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহম্মদ মোস্তফা আলী ও আলহাজ্জ আহমদ তওফিক চৌধুরীর সাথে বর্তমান ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী।

ডানে ঃ মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ-এর মজলিসে আমেলার সাথে নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ মোহতারম মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার ও মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে দেখা যাচ্ছে। পাশে উপবিষ্ট আছেন সদর মজলিস নাজির আহমদ ভুঁইয়া ও নায়েব সদর সফে দওম মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন।

বামে ঃ লন্ডন যাওয়ার পথে ঢাকায় যাত্রা বিরতিকালে পশ্চিম বঙ্গ ও আসামের আমীর মোহতরম মাশরেক আলী মোল্লা ও কলিকাতা জামাতের আমীর শাহ্জাদা পারভেজ-কে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমীর ও মজলিসে আমেলার কতিপয় সদস্যের সাথে দেখা যাচ্ছে।

ডানে ঃ অষ্ট্রেলিয়া জামাতের আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মাওলানা মাহমুদ আহমদ-এর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, ঢাকা জামাতের আমীর, আনসারুল্লাহ্র মজলিসে আমেলার সদস্যবৃন্দ, ত্রৈমাসিক আনসারুল্লাহ্-এর সম্পাদক,সহযোগী সম্পাদক এবং কতিপয় সদর মুরব্বীকে দেখা যাচ্ছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের মজলিসে আমেলার কতিপয় সদস্যের সাথে হুযুর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মাওলানা ফিরোজ আলম ও ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব ও মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী সাহেবকে দেখা যাচ্ছে।

মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত দ্বাদশ তালীমুল কোরআন ক্লাসে সদর মজলিস নাজির আহমদ ভুইয়া, নায়েব সদর সফে দওম মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন ও কায়েদ উমুমী আবদুল জলিল ক্লাস নিচ্ছেন।

উপরে ঃ হুযুর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মাওলানা ফিরোজ আলম ও বাংলাদেশ জামাতের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেবকে কেব্‌ল-লাইনে এমটিএ (MTA)-এর দর্শকদের সম্মানে চট্টগ্রাম জামাত কর্তৃক আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে।

ডানে ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম-এর মজলিসে আমেলার সাথে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব ও চট্টগ্রাম জামাতের আমীর মোবাশ্বেরুর রহমান সাহেবকে দেখা যাচ্ছে।

যিক্‌রে ইলাহীর স্বরূপ

কুরআন মজীদ পাঠে যিকর সম্বন্ধে মোটামুটি নিম্নলিখিত আয়াতগুলো পাওয়া যায়:

(১) আল্লাযীনা আমানূ ওয়া তাত্বমাইন্নু কুলূবুহুম বি যিক্‌রিল্লাহি – আলা বি যিক্‌রিল্লাহি তাত্বমাইন্নুল কুলুব – (অর্থঃ যারা বিশ্বাস আনে ও যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখো! আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে – সূরা রা'দ : ২৯ আয়াত)।

(২) ইন্নাস্ সালাতা তানহা 'আনিল ফাইশাই ওয়াল মুনকার ওয়ালাযিক্‌রুল্লাহি আকবর [অর্থঃ নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে; আর অবশ্যই আল্লাহ্‌র যিক্‌র (স্মরণ) হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ (পুণ্য)- সূরা আনকাবূত : ৪৬ আয়াতাংশ]।

(৩) ইয়াআয়্যুহাল্লাযীনা আমানূয্‌কুরুল্লাহা যিকরান কাসীরাওঁয়া সাব্বিহূহু বুকরাতাওঁয়া আসীলা – (অর্থঃ হে যারা বিশ্বাস এনেছো! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো। এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর তসবীহ ও পবিত্রতা ঘোষণা করো – সূরা আহযাব: ৪২-৪৩ আয়াত)।

(৪) আলাম ইয়া'নিলিল্লাযীনা আমানূ আন তাখশা'আ কুলূবুহুম লিযিক্‌রিল্লাহ্ ওয়ামা নাযালা মিনাল হাক্ক- (অর্থঃ যারা বিশ্বাস এনেছে তাদের জন্যে এখনও কি সেই সময় আসে নি, যখন তাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্যে আর যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে উহার জন্যে ভয় বিনীত হয়? – সূরা হাদীদ: ১৭ আয়াতংশ)

(৫) ইয়াআয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ লা তুলহিকুম আমওয়ালুকুম ওয়ালা আওলাদুকুম 'আন যিক্‌রিল্লাহ্ ওয়ামা ইয়ফ্'আল যালিকা হুমুল খসিরূন (অর্থঃ হে যারা বিশ্বাস এনেছো! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। এবং যারা এরূপ করবে – তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে- সূরা মুনাফিকূন; ১০ আয়াত)

(৬) ইয়াআয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ ইযা নূদিয়া লিস্‌সালাতি মিইঁয়াওমিল জুমু'আতি ফাস'আও ইলা যিক্‌রিল্লাহি ওয়া যারুল বায় যালিকুম খায়রুল্লাকুম ইনকুনতুম তা'লামূন (অর্থঃ হে যারা বিশ্বাস এনেছো! যখন তোমাদেরকে জুমুআর দিনে নামাযের জন্যে আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্যে দ্রুত এস ও ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করো। ইহাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা জানতে-সূরা জুমুআ: ১০ আয়াত)

যিকরে ইলাহী সম্পর্কে বহু হাদীসের মধ্য থেকে বিশেষ কতিপয় হাদীস উদ্ধৃত করা হলো:

(১) হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন – যে স্বীয় প্রভু-প্রতিপালককে স্মরণ করে আর যে স্মরণ করে না তাদের দৃষ্টান্ত যথাক্রমে জীবিত ও মৃতের ন্যায় (মুত্তাফিক আলায়হে)।

(২) হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন – আল্লাহ্‌র যিক্‌র ব্যতিরেকে বেশী কথা বোল না। কেননা, আল্লাহ্‌র যিক্‌র ছাড়া বেশী কথা অন্তর কঠিন হওয়ার কারণ, আর কঠিন হৃদয়-সম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে আল্লাহ্ থেকে দূরে (তিরমিযী)।

(৩) হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন – আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার নিকটে থাকি যখন সে আমার যিকর করে এবং আমার উদ্দেশ্যে তার ঠোঁট নড়ে (বুখারী)।

(৪) হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন – উত্তম যিক্‌র – 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (অর্থঃ আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই) এবং উত্তম দোয়া হলো – আল্‌হামদুলিল্লাহ্ (অর্থঃ সমস্ত প্রশংশা আল্লাহ্‌র) (তিরমিযী, কিতাবুদ্‌দাওয়াত)।

(৫) হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন – রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন – আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, যে আমার কোন বন্ধুকে শত্রু ভাবে আমি তার সাথে যুদ্ধ করি। আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না এমন কোন জিনিষ দ্বারা যা আমার নিকট প্রিয়তম হতে পারে আমি যা তার জন্যে ফরয (অবশ্য কর্তব্য নির্ধারিত) করেছি তা অপেক্ষা আর আমার বান্দা সর্বদা আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে থাকে নফল (অতিরিক্ত) ইবাদত উপাসনা দ্বারা। অবশেষে আমি তাকে ভালবাসি, আর আমি যখন তাকে ভালবাসি আমি হই তার কান যদ্বারা সে শুনে, আমি হই তার চোখ যদ্বারা সে দেখে, আমি হই তার হাত যদ্বারা সে ধরে এবং আমি হই তার পা যদ্বারা সে চলে। আর যখন সে আমার নিকট চায় আমি তাকে দিই এবং যদি সে আমার নিকট আশ্রয় চায় আমি তাকে আশ্রয় দিই, আর আমি ইতস্ততঃ করি না আমি যা করতে চাই – বিশ্বাসীর আত্মা গ্রহণ করার ন্যায় ইতস্ততঃ সে মৃত্যুকে অপসন্দ করে এবং আমি অপসন্দ করি তাকে অসন্তুষ্ট করাকে, কিন্তু মৃত্যু তার জন্যে আবশ্যক (তবেই সে আমার নিকট পৌছাতে পারবে) (বুখারী)।

যিক্‌র শব্দের আভিধানিক অর্থের প্রতি এক নজরঃ

(ক) স্মরণ করলো, মনে রাখলো। মহিমা কীর্তন করলো, ভালভাবে উপলব্ধি করলো, বিস্মৃত কথা স্মরণ করলো, চিরস্মরণীয় ব্যক্তি ও বস্তুকে যিক্‌র বলা হয়। সব সময় স্মরণ রাখার যোগ্য, জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করা হয়, মর্যাদা, গ্রন্থ, নবী-রসূল, গ্রন্থধারী, বার বার স্মরণ করা হয় যা প্রভৃতি (মুফরাদাত, মুনজিদ)।

(খ) যে বস্তু জিহ্বায় জারী থাকে, সুনাম, উচ্চতা, উপাসনা, নামায, দোয়া, ধর্মের বিস্তারিত গ্রন্থ, কুরআন মজীদ, বহুবচনে আয্‌কার, ধাতু-মূল কোন বিষয় স্মরণ, পাত্রীর বিয়ের কথা পাকা, কারও অধিকার স্মরণ প্রভৃতি (মিফতাহুল লুগাত)।

(গ) সদা উচ্চারিত বাক্য, স্মরণ, সুনাম, উচ্চতা, দোয়া, দীন তথ্য সম্বলিত পুস্তক (কাওসার)।

(ঘ) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) যিকরের অর্থ করেছেন– সুখ্যাতি, নামায, দোয়া, কুরআন তেলাওয়াত, তসবীহ্ শোকর, ইতায়াত বা আনুগত্য, আল্লাহ্‌র হামদ ও প্রশংসা, সম্মান-মর্যাদা প্রভৃতি।

কুরআনের উপরোক্ত পবিত্র আয়াতসমূহ, নবী করীম (সাঃ)-এর

পবিত্র হাদীসসমূহ এবং যিক্‌র-এর আভিধানিক অর্থ থেকে যিক্‌রে ইলাহী সম্বন্ধে আমার যা জানতে পারি তা সংক্ষেপে এরূপ ঃ

(১) যিক্‌রে ইলাহী বলতে সর্বদা আল্লাহ্‌, তাওহীদ ও একত্ববাদ এবং আল্লাহ্‌কে তাঁর গুণাবলীসহ স্মরণ রাখা, তাঁর মাহাত্ম্য ও গৌরব ঘোষণা করা ও তাঁর প্রশংসার গীত গাওয়া। এবং নিজ জীবনে ওগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন গড়ে তোলা। আল্লাহ্‌র সদা বিরাজমানতা সর্বদা স্মরণে রাখা এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বানানো, শয়নে-স্বপনে তাঁকে- কেবল তাঁকেই স্মরণ রাখা ও তাঁর নিকট ভিখারী হয়ে থাকা – তাঁর করুণা ভিক্ষা করা।

(২) নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ যিক্‌র সম্ভব। নফল নামাযের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্‌তে বিলীন হয়ে তাঁর গুণে গুণান্বিত হয়, ঐশী ইচ্ছা ও অনুমোদনে ঐশী কার্য-কলাপ প্রদর্শনে সক্ষম হয়, অন্য কথায় এর নাম মুজে'যা।

(৩) যিক্‌রের কথাগুলো শুধু মাত্র জিহ্বা দ্বারা আওড়ালে হবে না। এগুলোর অর্থ উপলব্ধি করত: হৃদয়ে এগুলোর উপলব্ধি দ্বারা ব্যবহারিক জীবনে এর প্রতিফলন থাকতে হবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ) বলেন – "কাজেই যিক্‌রে ইলাহী সমগ্র মানবজীবনে অবশ্যই পরিব্যপ্ত। তাই এর মানে এই যে, প্রত্যেক কাজ ও কর্ম-ব্যস্ততা ও কৌতুহল যেন আল্লাহ্‌র দিকে মানুষের মনযোগকে ফিরিয়ে দেয় এবং অন্তর যেন এরূপ উদ্বেলিত-উচ্ছলিত হয় যেরূপ দুগ্ধপুষ্য শিশু মায়ের বুকের দিকে উদগ্রীব হয় .....এসব কিছু নামাযের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতিস্বরূপ। যদি এ পরিমণ্ডল রচিত ও স্থাপিত হয় তবেই নামাযে যিক্‌র প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে (খুৎবা জুমুআ: ২৬-১১-৯৩ ইং)।

(৪) সবশ্রেষ্ঠ যিক্‌র হলো আল্লাহ্‌ তাআলার তওহীদ প্রতিষ্ঠা, এ জন্যে সারা জীবন চেষ্টা-সাধনা করা, শুধু মাত্র মুখে লক্ষ লক্ষ বার এর উচ্চারণের মাধ্যমে কোন ফলোদয় হতে পারে না।

খেলাফত ব্যবস্থার অবলুপ্তির পরে অর্থাৎ বিকৃতির যুগে ইসলামের মধ্যে এ যিক্‌রে ইলাহী নিয়ে বিভিন্ন মতাদর্শের জন্ম হয়েছে। যিক্‌রে ইলাহীর নামে নতুন নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছে। এমন কি নামায প্রভৃতির চেয়েও যিক্‌রে ইলাহী অর্থাৎ তাদের প্রবর্তিত পদ্ধতিসমূহকে শ্রেয়তর মনে করা হয়েছে ও হচ্ছে। অথচ এর কোন সমর্থন কুরআন ও সুন্নতে নব্‌বী (সাঃ)-এর মধ্যে নেই। সুতরাং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (আইঃ) বলেন – "সবচে' গুরুত্বপূর্ণ যিক্‌র হচ্ছে ইবাদত প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ সেই নামাযের প্রতিষ্ঠা যা কুরআন করীম বর্ণনা করেছে। যে নামাযকে হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) তাঁর পবিত্র সুন্নত ও জীবনাদর্শন দ্বারা কার্যকর করে দেখিয়ে গেছেন। সবচে' শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট যিক্‌র উহাই বটে, যদি তা না থাকে তাহলে বাকী সব যিক্‌রের কোন মূল্যই থাকে না। কোন গুরুত্বই থাকে না। অতএব নামাযের ওপরে বিশেষ জোর দিন" (খুতবা জুমুআ, ২৬.১১.৯৩ ইং)।

বক্রতার যুগে যিক্‌রের যেসব মতাদর্শ ও পদ্ধতিসমূহ উদ্ভাবন করা হয়েছে এখন সেগুলো সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবার সাহায্যে নেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এখানে পুনরায় উল্লেখ করছি যে, এ সব উদ্ভাবনের পেছনে কুরআন সুন্নত এবং সাহাবায়েকেরামের কোন অনুমোদন নেই। এসব পদ্ধতি যারা আবিষ্কার করেছেন তারা উম্মতকে নামায থেকে এক প্রকার তওবা করার তাগিদ দিয়েছে। তারা বলেছে - 'রাতদিন যিক্‌রের মধ্যে মশগুল থাকো নামাযের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।' অর্থাৎ কথাটা এই দাঁড়ায় যে, হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর চেয়েও উন্নত মানের যিক্‌র তারা আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছে। এ যেন 'মায়ের চেয়ে মাসীর দরদী বেশী', আর কি। যিনি দোজাঁহানের নেতা তিনি যিক্‌র বুঝেন নি বুঝেছেন তারা। তিনি (সাঃ) তো ছিলেন স্বয়ং যিক্‌র – মূর্তিমান যিক্‌র। যিক্‌রে এলাহী তো তাঁর কাছ থেকেই আমাদের শিখতে হবে।

সিলসিলা চিশ্‌তিয়া ঃ

'চিশতিয়া' একটি বিখ্যাত সিলসিলা। তাদের ওখানে কলেমা তাইয়্যেবা অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ পাঠ কালে 'ইল্লাল্লাহ্‌'-এর ওপরে অত্যধিক জোর দেয়া হয়। একে বলে আঘাত হানা। এ রকম করতে করতে তাদের শরীর কাঁপতে থাকে এবং একটি ভাবাবিষ্ট অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন তারা বলে, দেখ এ হচ্ছে যিক্‌র, এ সকল লোক সাধারণতঃ যিক্‌রস্বরূপ বাক্যগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকে এবং নিজের মাথা ও শরীরের ওপরের অংশ দোলাতে থাকে। শিয়াদের মধ্যে এ ধরনের যিক্‌র-এর প্রচলন বেশী। এদের আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো 'সামা' নামক ভক্তিমূলক গান। এ গান শুনতে শুনতে যিক্‌র চলতে থাকে ও একটি ভাব-গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করে। নানা প্রকার আগরবাতি, আতর ইত্যাদির গন্ধে এলাকা থাকে ভুরভুরে। এরা এক প্রকার গেরুয়া পোষাকও পরিধান করে থাকেন। এদের মধ্যে আবার বিভিন্ন শ্রেণীভেদ রয়েছে। যেমন, হযরত খাজা হাসান নিযামীর 'চিশতিয়া নিযামিয়া।' এদের নানা প্রকার যিক্‌রের পদ্ধতি আছে। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মধ্যে এর সমর্থন নেই বলে বিস্তারিত আলোচনার গেলাম না। তবে যারা বিস্তারিত জানতে চান তারা 'কিতাব আমাল হিযবুল বাহার' শাসসুল উলামা খাজা হাসান নিযামী দেহেলভী প্রণীত, নবম সংস্করণ, জুলাই ১৯০৪, দিল্লী দেখতে পারেন।

সিলসিলা নকশ্‌বন্দীয়া ঃ

নকশ্‌বন্দীরা প্রথমে সুন্নত বিবর্জিত পন্থা অবলম্বন করে নি। পরে শায়খের কল্পনা মিশ্রিত হয়ে তাদের বিচ্যুতি ঘটেছে। তারা যিক্‌রে জলী (উচ্চস্বরে যিক্‌র)-এর বিরোধী। তারা 'যিক্‌রে খফী (নিঃশব্দ যিক্‌র)- কে বৈধ মনে করে থাকে। মোরাকাবার সময়ে মাথা নত করে মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে খোদাতাআলার ধ্যানে মগ্ন হওয়ার মত একটি পদ্ধতি তাদের মধ্যে চালু আছে। তাদের মাঝে মুর্শেদ ও মুরীদান পৃথক বসে না। তারা শরীয়তের আদেশ-নিষেধকে কঠোরভাবে পালন করে থাকেন। প্রথমে তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর ধ্যান-মগ্ন হওয়া প্রাধান্য লাভ করেছিলো। পরবর্তীকালে আল্লাহ্‌র স্থান দখল করে নিলো মুর্শেদ। খোদার স্থানে তারা শায়খের কল্পনা করতে আরম্ভ করলো এবং খোদা ও শায়েখের মধ্যে কোন পার্থক্য আর অবশিষ্ট থাকলো না।

সিলসিলা কাদেরিয়া ঃ

কাদেরিয়া সিলসিলা বেশীর ভাগ সুন্নী ইসলাম সম্পৃক্ত। পাক- ভারত বাংলাদেশ উপমহাদেশের অধিক সংখ্যক মৌলবী- মৌলানা এ সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত। এরা সামা জাতীয় সংগীতের বিরোধী। তারা সাধারণতঃ সবুজ পাগড়ী পরিধান করে থাকেন এবং তাদের পোষাকের কোন কোন অংশ গেরুয়া রং এর। এরা উভয় প্রকার যিক্‌র এর পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। প্রথমতঃ এরা তৌহীদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা প্রকার শিরকে লিপ্ত হয়েছেন।

সিলসিলা সোহ্‌রাওয়ার্দী ঃ

এরা এক বিশেষ পদ্ধতিতে যিক্‌র করেন। যেমন নিঃশ্বাস বন্ধ করে 'হু'-এর বেরেদ বা বারে বারে উচ্চারণ করতে থাকেন। অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পর্যন্ত নিঃশ্বাস বন্ধ রাখেন তারপর পুরো জোরে যখন নিঃশ্বাস বের করেন তখন 'হু' শব্দ উত্থিত হয়। গান-বাজনা তারা পসন্দ করেন না। কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি বিশেষভাবে জোর দিয়ে থাকেন।

সিলসিলা আগাখানী ঃ

ইসমাঈলিয়া ফির্কার লোকেরা এ যিক্‌র করে থাকেন। প্রকৃত ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তারা হযরত আলী (রাঃ)-কে খুবই গুরুত্ব দেন। এমন কি আল্লাহ্‌র স্থলে বসান বল্লেও অত্যুক্তি হবে না। তারা ইমামতে বিশ্বাসী। হিজ হাইনেস প্রিন্স আগা খান তাদের নেতা। তাদের দোয়া এরূপ – 'আটচল্লিশতম ইমাম, দশম, নির্দোষ অবতার। আমাদের খোদাওন্দ আগা সুলতান মুহাম্মদ দাতা' ইহা বলে তারা সিজদা করে থাকেন।

সিলসিলা যিক্‌রী ঃ

তারা প্রত্যেকদিন ২ হাজার বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করেন। তাদের যিকরের বাক্যগুলো হচ্ছে – হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ্ আল্লাহু আল্লাহু (দারামী পৃ:১১, আব্বাসী লিথু আর্ট প্রেস, ফেয়ার রোড, করাচী)। তাদের ধারণা মাহদী দুনিয়াতে এসে নামায, রোযা ইত্যাদি ইসলামের সব আরকান মাফ করে দিয়েছেন। নামাযের স্থলবর্তী হয়েছে এখন যিক্‌র। যিক্‌র করা ফরয। তারা যিক্‌রে জলী ও যিক্‌রে খফী উভয়ই করে থাকেন।

সিলসিলা আসহাবুর রূহানিয়তঃ

এদের ধর্মীয় বিশ্বাস হচ্ছে- বিশ্বজগতের একজন পবিত্র স্রষ্টা আছেন। তাঁর নৈকট্য ফিরিশ্‌তাদের মাধ্যমে পাওয়া যায়। তাই তারা মনে করেন ফিরিশ্‌তা তাদের রব, সৈয়্যদ ও শাফায়াতকারী। তাদের মাধ্যমে রবদের রব ও ইলাহ্‌দের ইলাহ্ পর্যন্ত পৌছা যায়। তারা যিক্‌র করে ও ফিরিশ্‌তাদের আনুগত্যকে জরুরী মনে করে (আল্ মিলান ওয়ান্ নিহাল, আল্লামা শহরস্তানী, প্রণীত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৯)

সিলসিলা বেরেলভী :

এরা আল্লাহ্‌র বদলে মুর্শেদের নাম জপতে থাকে। তাদের অভিনব যিকরের বিস্তারিত পদ্ধতি আহমদ রেযা খান প্রণীত মল্‌ফুযাত-এর মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। এদের একটি দোয়া এরূপ যার কোন অর্থ হয় না – লা ইলাহা মান কানা – ইল্লাল্লাহা তান কানা ইত্যাদি। ইহার উল্লেখ আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, এ ধরনের আরও বহু যিক্‌র পদ্ধতি ইসলামের নামে আবিষ্কার করা হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। কিন্তু আসল যিক্‌রে ইলাহী আমাদের শিখা উচিত আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট থেকে। আর যিকরে ইলাহী উহাই যা হযরতে আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) শিখেছেন আল্লাহ্‌তাআলার নিকট থেকে। খোদাতাআলার পথ-নির্দেশনায় তিনি নিজ সত্তায় তা প্রবর্তন করে দেখিয়ে গেছেন। একমাত্র ঐ যিকরকেই আমাদের দৃঢ়ভাবে ধরতে হবে। তবেই আমরা সফলতা লাভ করবো আর ঐ যিক্‌রই আমাদেরকে আল্লাহ্‌তাআলার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিতে যোগসূত্র সাব্যস্ত হবে এবং আমাদের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করবে।

যিক্‌র ও দোয়ার মধ্যে পার্থক্য ঃ

যারা মূর্তিমান যিক্‌র হয়ে যান তাদের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন, তাদের প্রত্যেক আশা-আকাঙ্খা দোয়ায় পর্যবসিত হয়, দোয়া ও যিক্‌রের মধ্যে এই পার্থক্য। যিক্‌রে ইলাহী যাদের জীবনকে ছেয়ে ফেলে তারা খোদাতাআলার নিকট চাইবারও সুযোগ পান না বা তারা যেভাবে যিক্‌রের অমৃত সুধা পানে ব্যাপৃত থাকেন তাদের আর কিছুই চাইবার থাকেও না। এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তাআলা তার ঐ বান্দার বন্ধু হয়ে যান এবং তাঁর রহমানীয়তের গুণের বিকাশ ঘটান। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর ঐ বান্দাদের তাদের প্রয়োজন অতিরিক্ত দিয়ে থাকেন। এ অবস্থাকে বুঝাবার জন্যে আঁ হযরত (সাঃ) বুখারী শরীফের কিতাবুর রিকাকে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন – হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।' সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার এ নিবিড় সম্পর্ক কেবল মাত্র যিক্‌রে ইলাহীর মাধ্যমে স্থাপিত হয়ে থাকে। সুতরাং দোয়ার চেয়ে যে যিক্‌রের বিষয়-বস্তু শ্রেয়ঃ এবং শ্রেষ্ঠতর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য কুরআন করীমে আল্লাহ্‌র যিক্‌রে নিয়োজিত থাকার অর্থেও দোয়া শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে (১৮ঃ৩২)। আবার দোয়া শব্দ-দ্বারা কেবল চাওয়া বুঝায় না বরং ডাকা ও আহ্‌বান করাও বুঝায়। অতএব দোয়া ও যিক্‌র একস্থানে গিয়ে একীভূত হয়ে যায়। আল্লাহ্‌তাআলার যিক্‌রের বহির্প্রকাশ ঘটে তার আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে। **এক বান্দা যখন সঠিকভাবে আল্লাহ্‌তাআলার আদেশ-নিষেধ ও শরীয়তের বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে পালন করে তখনই কেবল তাঁর নাম ধরে যিক্‌র করা ঐ বান্দার পক্ষে শোভনীয় ও সমীচীন হয় এবং সে আল্লাহ্‌তাআলার বন্ধু হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। এমতাবস্থায় ঐ বান্দা আল্লাহ্‌তাআলার নিকট চাইলেও পান আর না চাইলেও পেয়ে থাকেন। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর নিগরান ও অভিভাবক হয়ে যান।** এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসের উল্লেখ প্রথমেই

করা হয়েছে-বান্দার পরিপূর্ণ আত্মবিলীনতার ফলে আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর বান্দার মাধ্যমে নিজ অস্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন। অসম্ভব কাজকে সম্ভবে পরিণত করে দেখান। উহার নাম বলা যেতে পারে মু'যেজা। যিক্‌র ও দোয়ার মাধ্যমে ফলতঃ বান্দার সাথে আল্লাহ্‌তাআলার এমন বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় যে, বান্দার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌তাআলার গুণাবলীর বিকাশ ঘটে থাকে। এ রকম ঐশী গুণের বিকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি বদরের প্রান্তরে, বয়াত রিযওয়ানে এবং চন্দ্র-দ্বিখন্ডিত করার সময়ে আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনে।

তসবীহ গণনার তাৎপর্য ঃ

অ-আহমদী থাকার সময়ে মৌলবী-মাওলানা ও প্রবীণদের দেখাদেখি তসবীহ্‌র মালা দ্বারা গুণে গুণে দোয়া দরূদ পাঠ করেছি ঢের। বিশেষ করে শবে বরাত ও শবে কদরে যখন প্রায় সারা রাত ধরে নফল নামায ও দোয়া-দরূদ পাঠ করতাম। কিন্তু আহমদী হওয়ার পরে আহমদী মৌলবী-মাওলানাই হোন আর নবীন-প্রবীণই হোন কাউকে তসবীহ্‌র মালা গুণতে দেখিনি। অবশ্য ১৯৬৭ ও ১৯৭৪ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) দরূদ পাঠ করার তাহরীক করেন। তখন বাধ্য হয়ে তসবীহ্‌র মালার সাহায্য নিতে হয়েছিলো আমাদের। এ তসবীহ্‌র মালার অনুমোদন সুন্নতে আছে কিনা তা জানার প্রবল বাসনা নিয়ে পড়াশুনো করে জানতে পেরেছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর মধ্যে তসবীহ্‌র মালার কোন রেওয়াজ ছিলো না। এগুলো বিজাতীয় সংস্কৃতি থেকে ইসলামে আমদানী করা হয়েছে। আমার মনে হয় তসবীহ্‌র মালার সাহায্য যদি নিতেও হয় তাহলে গোপনে করা উচিত যাতে রিয়া বা অহংকার সৃষ্টি না হয়। কিন্তু ইহাকে ব্যবহার করা হয় বুযর্গী দেখাবার জন্যে। তসবীহ্‌র ব্যবহারে সৌদি আরবের লোকেরা ওস্তাদ । আর সেখানে কত প্রকারের তসবীহ যে পাওয়া যায় তার ইয়ত্তা নেই। তসবীহ সর্বদা তাদের হাতে থাকে। এটা ফ্যাসানে পরিণত হয়েছে। হাটছে চলছে কথা বলছে হাতে তসবীহ্ আছে ও গুণছে। এমনকি শুনা গেছে যে, ধূমপান করছে তো হাতে তসবীহ্ আছে। আমাদের দেশেও সকাল বেলা হাঁটতে বেরুলে দেখা যায় অনেক যুবকের হাতেও তসবীহ্‌র মালা। এটা বিসদৃশ। হাঁটতে চলতে ফিরতে আমরাও যিক্‌রে ইলাহী করে থাকি। প্রয়োজনে অবস্থা ভেদে বিভিন্ন দোয়া-দরূদ পাঠ করে থাকি। আর যদি গুণতেই হয় কোন সময় যেমন নামাযের পরে সুব্‌হানাল্লাহ্ আল্‌হামদুলিল্লাহ্, আল্লাহু আকবর এবং সালাতুত্তাসবীহ্-এর নামাযের দোয়া তাহলে তা হাতেই গণনা করা উচিত।

একদিনের একটি মজার ঘটনা মনে পড়ে গেল। ১৯৭৭ সনের দিকে আমি তখন ব্যবসা করি। টাকা জমা দিতে সন্ধ্যার সময় মহাজনের ঘরে গেলাম। মহাজন উপেন সাহা। তাকে দেখলাম রেডিওটা ছেড়ে গান শুনছেন আর ইয়া বড় বড় জপের মালা ঠেলছেন! এটা আমি মনে করি সৃষ্টিকর্তার সাথে তামাশা বৈ কিছু নয়। কোন কোন লোককে দেখা যায় তসবীহ্ পড়ছেন আর অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। সুতরাং এথেকে আমাদের বেঁচে থাকা দরকার। তসবীহ প্রসঙ্গে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)- কে প্রশ্ন করা হলে তিনি যা বলেন তা আমাদের মনে রাখা উচিত। হুযূর (আঃ) বলেন,

"তসবীহ জপেন এমন ব্যক্তির আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গণনা পুরো করা। আর সে এ গণনা পুরোই করতে চায়। এখন তুমি নিজে বুঝতে পারো যে, হয়তো সে গণনা পুরো করে অথবা ধ্যান নিবদ্ধ করে। আর ইহা পরিষ্কার কথা যে, গণনা পুরো করতে সচেষ্ট ব্যক্তি সত্যিকারের তওবা করতেই পারে না। আম্বিয়া আলায়হেমুস্ সালাম এবং তাদের মান্যকারী ব্যক্তিবর্গ যাঁদের আল্লাহ্‌তাআলার ভালবাসা লাভের শখ আছে এবং যারা আল্লাহ্‌তাআলার ভালবাসায় বিলীন হয়ে থাকেন তারা গণনা করেন না, আর তারা এর প্রয়োজনও অনুভব করেন না। সত্যের অনুসারীরা তো সর্বদাই খোদাকে স্মরণ করে থাকেন। তাদের জন্যে গণনার প্রশ্ন এবং ধারণাই অযথা। কেউ কি তার ভালবাসার মানুষের নাম গুণে গুণে নেয়? যদি খোদাতাআলার সাথে সত্যিকারের ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হয় আর আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ধ্যান সৃষ্টি হয় তাহলে আমি বুঝতে পারি না যে, কেন গণনার ধারণা সৃষ্টি হবে। তারা তো এ যিক্‌রকে নিজেদের আত্মার খোরাক মনে করবে এবং যত বেশী করে করবে ততই স্বাদ ও মজা পাবে এবং এতে আরও উন্নতি করবে। কিন্তু যদি কেবল গণনাই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয় তাহলে তারা ইহাকে একটি বেহুদা কাজ মনে করে গণনা পূর্ণ করতে চাইবে" (আল্ হাকাম, ৮ খণ্ড ১৯-২০ নম্বর, পৃষ্ঠা ২-৩, ১০-১৭ই জুন, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ)

বি'দাতি ফকীর ও পীরদের হালকা যিক্‌র ঃ

বাংলাদেশের আনাচে কানাচে এমন বহু পীর-ফকীর দেখা যায় যারা নিজেদেরকে মা'রেফতী লাইনের লোক বলে পরিচয় দেন। বিভিন্ন ধরনের পোষাক-আশাক পরিহিত এসব লোকেরা দল বেঁধে গাঁজা ইত্যাদি নেশা দ্রব্য ব্যবহার করে নানা প্রকারে সামা গান ইত্যাদি গেয়ে যিক্‌রের মজলিস করে থাকেন নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত সময়ে। এতে আগরবাতি ও মোমবাতি জ্বালানোর ধুম পড়ে এবং খুবই সওয়ারের কারণ মনে করা হয়। অথচ নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনে কখনও আগরবাতি ব্যবহার করার নজীর পাওয়া যায় না। হযরত উমর (রাঃ)-এর সময়ে গনিমতের মাল হিসেবে এক খণ্ড উদ (সুগন্ধি কাঠ জাতীয় দ্রব্য) পাওয়া গেল। যেহেতু ইহা সবাইকে ভাগ করে দেয়া যায় না তাই তিনি মসজিদে ইহা জ্বালাতে নির্দেশ দিলেন যাতে সবাই এর সুগন্ধ ভোগ করতে পারে। এ থেকেই মনে হয় মসজিদে সুগন্ধি জ্বালানোর রীতি চলে আসছে। তবে ইহা ধর্মের কোন অঙ্গ নয়। এসব লোক ইসলামী সুন্নত ও নামায-কালামের তেমন ধার ধারে না। তাদের মধ্যে আবার বহু শ্রেণীভেদ রয়েছে। তারা বলেন, সারাদিনইতো যিক্‌র করি আবার নামাযের কি প্রয়োজন? তারা কুরআনের এ আয়াত – ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর (অর্থ : আর অবশ্যই আল্লাহ্‌র যিক্‌র হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ – সূরা আনকাবূত ৪৬ আয়াতাংশ) উদ্ধৃত করে এর অপব্যাখ্যা ও কদর্থ করেন এবং বলেন যে, নামাযের চেয়েও যিক্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ। তারা ইহা বুঝতে চান না যে, কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখাকারী হলেন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। আর কুরআনের অনুশাসন

কীভাবে পালন করতে হয় তা তিনি (সাঃ) তাঁর ব্যবহারিক জীবনে দেখিয়ে গেছেন। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নামাযের মাধ্যমে যে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয় তা সর্বশ্রেষ্ঠ। তারা যে ধরনের যিক্‌র করেন নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনে তা দেখতে পাওয়া যায় না। এমন কি সাহাবা কেরাম (রাঃ)-এর সুন্নতেও তা পাওয়া যায় না।

ঐ সব লোকেরা নবী আকরম (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীস দু'টোকে উদ্ধৃত করে বুঝাতে চান যে, নবী করীম (সাঃ) সাহাবাদের নিয়ে এ রকম মজমা' (দল বেঁধে যিক্‌রের হালকা) করতেন ঃ

(১) হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার নিকট সেরূপ যেরূপ সে আমাকে মনে করে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি যে স্মরণ করে আমাকে মনে স্মরণ করি আমি তাকে আমার মনে। আর যদি স্মরণ করে আমাকে মানুষ দলে স্মরণ করি আমি তাকে তাদের অপেক্ষা উত্তম দলে (মুত্তাফিক আলায়হে)।

(২) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন – যখন তোমরা বেহেশ্‌তের বাগানে পৌছুবে উহার ফল খাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হুযূর, বেহেশ্‌তের বাগান কী? তিনি (সাঃ) বল্লেন, যিকিরের হালকা (তিরমিযী)।

এসব হাদীসের সনদ সম্বন্ধে হাদীস শাস্ত্র বিশারদগণের অভিমত হলো–"হাসান গরীব।"

তবুও এসব হাদীসের প্রয়োগে আমরা যদি বিভিন্ন তালীম তরবীয়ত ও তবলীগ সম্পর্কিত মাহফিল, ইজতেমা, জলসা প্রভৃতি অনুষ্ঠান মনে করি তাহলে এ হাদীসের সমন্বয় সাধিত হতে পারে। কিন্তু এ হাদীস দ্বারা কোন ক্রমেই দলবেঁধে গাঁজা খেয়ে নানা রকম কালাম উচ্চারণ করে ও নানা প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গি করে যিক্‌র করা বুঝায় না। আল্লাহ্‌তাআলার যিক্‌রের উত্তম স্থান হলো মসজিদ; কিন্তু এসব লোকদের সাধারণত: মসজিদের চত্বর মাড়াতে কখনও দেখা যায় বলে মনে হয় না। যারা এসব যিক্‌রে বিশ্বাসী তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা যায় যে, আল্লাহ্‌তাআলা বলেন – ফাযকুরুনী আযকুরুকুম ওয়াশকুরূলী ওয়ালা তাকফুরূন অর্থাৎ সুতরাং তোমরা আমার 'যিক্‌র' করো আমিও তোমাদের 'যিক্‌র' করবো আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়োনা আমার প্রতি (২ঃ১৫৩)। এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তাআলাও কি তাদের ন্যায় যিক্‌র করেন বলে মনে করতে হবে? আসল কথা এই যে, বান্দা যদি আল্লাহ্‌তাআলাকে সর্বদা স্মরণে রাখে তাহলে আল্লাহ্‌তাআলাও বান্দাকে সর্বদা স্মরণে রাখবেন। আর একজন বিশ্বাসীর সর্ব্বোচ প্রাপ্য এই যে, আল্লাহ্‌তাআলা যেন সর্বদা তাকে স্মরণে রাখেন অর্থাৎ প্রত্যেক সময়ে বন্ধুর মত তার পাশে থাকেন। এতেই বিশ্বাসীর জীবন ধন্য হয়। উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা কখনও ইহা বুঝাতে চাচ্ছি না যে, যিক্‌রে ইলাহী বলতে কিছু নেই। আমরা বুঝাতে চাই যে, এসব লোক যেভাবে যিক্‌রে ইলাহী করে এর কোন সমর্থন নেই আল্লাহ্‌র বিধানে এবং নবী (সাঃ)-এর সুন্নতে। এগুলো সবই বি'দাতি কার্যকলাপ। আমাদের জামাতকে এথেকে বেঁচে থাকা দরকার। এখন আমরা কতকগুলো যিক্‌র সম্বন্ধে উল্লেখ করছি যেগুলো নির্ধারিত সংখ্যায় বা অসংখ্যবার পাঠ করলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা যায়ঃ

(ক) আমরা ইতোপূর্বে হাদীস থেকে জানতে পেরেছি যে, উত্তম যিক্‌র হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। এটা মানব জীবনের 'মটো' বা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ মানুষের এমন কাজ করা উচিত নয় যদ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া আরও কোন উপাস্য আছে। আর এমন সব কর্ম করা উচিত নয় যদ্বারা তারা জীবনে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আল্লাহ্‌তাআলাই একমাত্র উপাস্য ও কাম্য। এ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন – মান কূলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ফা দাখালাল জান্নাতা অর্থাৎ যে বলেছে – আল্লাহ্‌ ছাড়া উপাস্য নেই অতঃপর সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করেছে। আমাদের জামাতের তৃতীয় খলীফা হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ সাহেব (রাহেঃ) ১৯৮০ সনের ২রা নভেম্বর জামাতকে প্রত্যেক ফরয নামাযের পড়ে ১১ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' বেরেদ (অনুচ্চ স্বরে বারে বারে পাঠ) করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(খ) একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে বলা হয়েছে – কালিমাতানি খফীফাতানি 'আলালিসানি সাক্বীলাতানি ফিল মীযানি হাবীবাতানি ইলার্‌রহমানি সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, দু'টি সংক্ষিপ্ত বাক্য যা বলতে সহজ অথচ পাল্লায় ভারী ও আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয় তাহ'ল – আল্লাহ্‌ অতীব পবিত্র, তিনি তাঁর সার্বিক প্রশংসাসহ বিদ্যমান আল্লাহ্‌ অতীব পবিত্র অতীব মহান।

(গ) হাদীস পাঠে আরও জানা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) নিম্নোক্ত তসবীহগুলোও এবং পাঠ করার জন্যে তাঁর (সাঃ) উম্মতকে আদেশ দিয়েছেন (হযরত আবূ হুরায়রার বরাতে মুসলিম)।

(১) সুবহানাল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌ অতীব পবিত্র) ৩৩ বার
আল্‌ হামদুলিল্লাহ্‌ (সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র) ৩৩ বার
আল্লাহু আকবর (আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ) ৩৪ বার

(২) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু-ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর

অর্থঃ- আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই। সকল আধিপত্য এবং প্রশংসা কেবল তাঁরই, এবং তিনিই সকল কিছুর ওপরে সর্বশক্তিমান।

(ঘ) হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সালেস (রাহেঃ) ১৯৭৪ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে শতবার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত তস্‌বীহ, দরূদ, ইস্তেগফার প্রভৃতি পাঠ করার জন্যে ঘোষণা করেছিলেনঃ

(১) সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সাল্লি'আলা মুহাম্মাদিওঁয়ালি মুহাম্মদ।

অর্থঃ আল্লাহ্‌ অতীব পবিত্র ও নির্দোষ, এবং তিনি তাঁর সার্বিক প্রশংসাসহ বিদ্যমান। তিনি অতীব পবিত্র অতীব মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধর এবং অনুগামীগণের ওপরে বিশেষ আশিস বর্ষণ করো।

(২) আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি জামবিঁউ ওয়াআতুব ইলায়হি।

অর্থঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট সকল পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তাঁর দিকে তওবা ও প্রত্যাবর্তন করি।

(৩) রব্বানা আফরিগ্ আলায়না সাবরাওঁওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা 'আলাল কাওমিল কাফিরীন।

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদিগকে পূর্ণ-ধৈর্য দান করো আর আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় করো এবং আমাদিগকে অস্বীকারকারীদের মোকাবেলায় সাহায্য ও সফলতা দান করো।

(৪) আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে তাদের অন্তরে বা মোকাবেলায় রাখছি (যাতে তুমি তাদের মনে ভীতি সঞ্চার করো বা তাদিগকে বিরত রাখো) এবং আমরা তাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হতে তোমারই আশ্রয় শিক্ষা করি।

(কখনও 'নুহুরিহিম' স্থলে 'নুহুরি আ'দাইনা' অর্থাৎ আমাদের শত্রুদের অন্তরে বা মোকাবেলায় বলা হয়)।

(৫) হ্বাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নিমান্নাসীর।

অর্থঃ আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কার্য-নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক ও তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।

(৬) ইয়া হাফিযু ইয়া আযীযু ইয়া রাফিকু, রব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রব্বি ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ার হামনা।

অর্থঃ হে সংরক্ষণকারী বা রক্ষাকর্তা, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! সব কিছুই তোমার সেবক ও অনুগত। সুতরাং হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাদিগকে রক্ষা করো, সাহায্য করো এবং আমাদের প্রতি করুণা করো।

উপরোক্ত তসবীহ তাহমীদগুলো যত বেশী সংখ্যায় পাঠ করা যায় ততই কল্যাণজনক।

(৬) মুবাহালার যুগে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র রাবে' (আইঃ) নিম্নোক্ত তসবীহ ও দোয়াগুলো বেশী বেশী সংখ্যায় পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেনঃ

(১) আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাসহ্বিকা।

অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমি তাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড করো, এবং তাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করো ফেলো।

(২) রব্বি ইন্নী মাগলুবুন ফান্তাসির রাব্বি ইন্নী মাযলুমুন ফান্তাসির

অর্থঃ হে আমার প্রভু! আমি শত্রু দ্বারা পরাভূত। অতএব প্রতিশোধ গ্রহণপূর্বক তুমি আমাকে সাহায্য করো। হে আমার প্রভু! আমি শত্রুদ্বারা অত্যাচারিত অতএব প্রতিশোধ গ্রহণপূর্বক তুমি আমাকে সাহায্য করে।

(৩) রব্বি লা তাযার 'আলাল আরযি মিনাল কাফিরীনা দাইয়্যারা।

অর্থ: হে আমার প্রভু! তুমি ভূ-পৃষ্ঠে কোন গৃহবাসীকে নিষ্কৃতি দিও না।

(৪) রব্বি লা তাযার 'আলাল আরযি মিনাল কাফিরীনা শারীরা'

অর্থ: হে আমার প্রভু! তুমি ভূ-পৃষ্ঠে অস্বীকারকারীদের মধ্য থেকে কোন দুষ্টকে নিষ্কৃতি দিও না।

(৫) ইয়া রব্বি ফাসমা দোয়াঈ ওয়া মায্‌যিক 'আদাকা ওয়া 'আদাঈ ওয়ানজিয ওয়া'দাকা ওয়ানসুর আবদাকা ওয়া আরিনা আইয়্যামাকা ওয়া শাহ্‌হিরলানা হুসামাকা।

অর্থঃ হে আমার প্রভু! তুমি আমার দোয়া শুন আর আমার ও তোমার শত্রুদের খণ্ড-বিখণ্ড করো ও নিজ বান্দাকে সাহায্য করো এবং আমাদিগকে তোমার দিনগুলো দেখাও এবং আমাদের পক্ষ থেকে তুমি তোমার তরবারীর আঘাত হানো।

(৬) লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন'

অর্থঃ মিথ্যাবাদীদের ওপরে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ভাষায় প্রকৃত যিকর কী এ সম্বন্ধে উদ্ধৃতি পেশ করে এ প্রবন্ধের ইতি টানছি।

হুযূর (আঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, উত্তম যিক্‌রে ইলাহী কী হতে পারে? হুযূর (আঃ) উত্তরে বলেন, "নামাযের চেয়ে বড় আর কোন যিক্‌র নেই। কেননা, নামাযের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা আছে, (ইসতেগ্‌ফার) গুনাহ্ মাফ চাওয়া আছে। দরূদ শরীফ আছে এবং সকল প্রকার যিক্‌র একত্রিত করা হয়েছে। এখানে হুযূর (আঃ) 'আওরাদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন অর্থ সমস্ত প্রকারের যিক্‌র। নামাযের মাধ্যমে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট দূর হয়। বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। আঁ হযরত (সাঃ) যখনই একটু কষ্ট পেতেন - নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। এই জন্যই বলা হয়েছে "আলা বিযিকরিল্লাহি তাত্‌মাইন্নুল কুলুব" - শোন! সাবধান! জেনে রাখ যিকরে ইলাহী এমন জিনিস যদ্বারা মানুষের হৃদয় স্বস্তি বা আরাম পেয়ে থাকে।

হুযূর (আঃ) এমন ব্যক্তির উদাহরণ দিয়েছেন, যিনি আসলেই যিক্‌রে ইলাহীতে আরাম পেতেন অর্থাৎ আঁ হযরত (সাঃ)। কিন্তু আপনি যদি ঐ সব কারণ না বুঝেন, ঐ হৃদয়ের বিভিন্ন অবস্থা যদি বুঝতে না পারেন-যার কারণে তিনি নামাযে দাঁড়ালে আরাম পেতেন, তা হলে এই তত্ত্বকে বুঝতে পারবে না যে, যিকর কীভাবে হৃদয়কে প্রশান্তি দান করে। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বাণী আপনি শুনবেন। কিন্তু কোন ফল হবে না। হুযূর (আঃ) বলছেন, "হৃদয়ের প্রশান্তি বা আরামের জন্য নামাযের চেয়ে বড় আর কোন মাধ্যম নেই। অনেকে অনেক রকম যিক্‌র নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বানিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।"

"এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে যেমন, আঁ হযরত (সাঃ)-এর শরীয়তকে বাদ দিয়ে একটি নতুন শরীয়ত তারা রচনা করে দিয়েছে।" পীর সাহেবরা কত প্রকার দম, দরূদ, যিকর ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে। তারা বলছে যে, অমুক দম বা দরূদ পড়লে তোমাদের সমস্যার সমাধান হবে। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলছেন, এরা মুশরেক। এরা হুযূর আকরম (সাঃ)-এর শরীয়তের বিপক্ষে নিজ নিজ শরীয়ত বানিয়ে রেখেছে। হুযূর (আঃ) তারপর বলেছেন',

"আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, আমি নবুয়তের দাবী করেছি। কিন্তু আমি দেখছি আর আশ্চর্য হয়ে দেখছি যে, তারা শরীয়ত বানিয়ে নিয়েছে। নিজেরা যেন নবী হয়ে বসেছে।"

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে সঠিকভাবে যিক্‌রে ইলাহী করার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

– মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

আপনি কি 'কাদিয়ানী' জামাত সম্পর্কে জানতে চান?

তাহলে শুরু করা যাক একটা ঘটনা দিয়ে। সেদিন বসেছিলাম আমাদের কেন্দ্রীয় মসজিদের লাইব্রেরীতে। আমার কাজ ছিল বাইরে থেকে যারা আমাদের জামাত সম্পর্কে জানতে আসেন, তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করা। আলোচনা শেষে প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক দেওয়া। একবার আস্‌লো একই পরিবার থেকে বিভিন্ন বয়সের তিনজন লোক, সাথে একটা চিঠি। চিঠিটি পাঠিয়েছে তাদেরই এক আত্মীয় জার্মান থেকে। তাতে লিখা রয়েছে :-

জনাব আমীর সাহেব

আস্‌সালামু আলায়কুম

এই মুহূর্তে আপনি আমাকে চিনবেন না। কারণ বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় আপনার সাথে আমার কখনও পরিচয় ছিল না। আমি ঢাকা ভার্সিটি থেকে মাষ্টার্স করার পর দুই বৎসর প্রাইভেট ফার্মে চাকুরী করেছিলাম। পরে এক ফাঁকে জার্মান আসার সুযোগ পেয়ে যাই। আমি ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মী ছিলাম। দেশে থাকা অবস্থায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শুধু বিরোধিতাই শুনেছি। তাই কখনও আপনাদের কাছে যাওয়া হয়নি। কিন্তু জার্মানে এসে বুঝতে পেরেছি এই জামাতের কত গুরুত্ব। শত শত জার্মান নাগরিক মুসলমান এক হয়ে এই জামাতভুক্ত হচ্ছে। আমার এক পাকিস্তানী বন্ধুর দাওয়াতে আমি আপনাদের এক জলসায় যাই। জার্মানের ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত সেই জলসায় সারা বিশ্বের আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান নেতা জনাব মির্যা তাহের আহমদ সাহেবকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়। সেখানে গিয়ে দেখি আমার মত আরও অনেক বাংলাদেশী লোক, যারা দেশে থাকতে এই জামাতভুক্ত ছিল না, জার্মানীতে এসে আহমদী হয়েছে। তখন ব্যাপারটা আমি তলিয়ে দেখতে শুরু করলাম এবং কিছু বই-পুস্তক পড়তে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমিও আহমদী হয়ে যাই এবং আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া আদায় করি ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জামাতভুক্ত হতে পেরে। দেশে থাকলে হয়ত সম্ভব হত না। এতদিন আমরা অন্ধ ছিলাম। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে যে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনের সংবাদ রয়েছে তা আমাদের জানাই ছিল না। আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি যেন একজন ভাল কর্মী হতে পারি। দেশে আসলে দেখা করব, ইন্‌শাল্লাহ্‌। আমি এখানে থেকে আপনাদের ঠিকানা জোগাড় করে আমার আত্মীয়দের নিকট লিখে পাঠিয়েছি তারা যেন উক্ত ঠিকানায় এসে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে। দয়া করে তাদেরকে ব্যাপারটা বুঝাবেন এবং পড়ার জন্য বই-পুস্তক দিবেন।

আজ এখানেই রাখি।

ইতি.....

সোনাগাজী, ফেনী।

দেখুন, একটা বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে না জেনে, শুনা কথার উপর মন্তব্য করা বা কোন প্রকার সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক নয়। দুনিয়ার কোন কাজ করতে এমনটি কিন্তু আমরা করি না। যেমন, আমি চাকুরী করতে বিদেশে যাব অথবা ছেলেকে পাঠাব। ভিসা একটা পেলে অমনি টাকা দিয়ে ফেলি না। প্রথমে যাচাই করে নিই, জেনুইন ভিসা নাকি জাল ভিসা। নিজে বুঝতে না পারলে ছুটাছুটি শুরু করে দিই, কোথায় গেলে সঠিক যাচাই করা যাবে। কনফার্মড্ হওয়ার পর টাকা দিয়ে থাকি। বিয়ের ব্যাপারেও তাই, পাত্র বা পাত্রীর সন্ধান পাওয়া মাত্রই পাকা কথা দিয়ে ফেলি না। প্রথমে যাচাই করে নেই। লেখাপড়া কতটুকু, কি কাজ করেন, আগে বিয়ে হয়েছে কিনা, বংশ কেমন ইত্যাদি জেনে পসন্দ হলে পরে দিন তারিখ ঠিক করি। অর্থাৎ দুনিয়ার কাজ-কর্মের বেলায় আমরা খুবই সজাগ যেন ঠকে না যাই, কিন্তু ধর্ম বা আখেরাতের ব্যাপারে নিজে সরাসরি গিয়ে যাচাই করি না দূর থেকে বলি দুনিয়ায় এত এত লোক তারা আসে না কেন? মৌলভীরা বিরোধিতা করে কেন? ইত্যাদি। অথচ বুদ্ধিমানের কাজটি হল একদিন সময় করে কেন্দ্রে গিয়ে নিজে সরাসরি আলাপ করে বিষয়টি সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হওয়া এবং আল্লাহ্‌তাআলার নিকট নামাযের মাধ্যমে দোয়া করা– এই বলে যে, হে আল্লাহ্‌ যদি এই জামাত সত্য হয়ে থাকে যদি চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে তোমার হাবীব মুহাম্মদ (সাঃ) এই জামাত গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে আমাকে দয়া করে এই জামাত সম্পর্কে জানার এবং বুঝার তৌফীক দান কর। মনে রাখবেন, আমরা যারা এই জামাতভুক্ত হয়েছি, পূর্বে আমাদের মধ্য থেকে কেউ তবলীগ জামাতের ছিলাম, কেউ পীরের মুরিদ ছিলাম, কেউ জামাআতে ইসলামের ছিলাম, কেউ ছিলাম আহ্‌লে হাদীসের, কেউ সাধারণ সুন্নী। সুতরাং 'কাদিয়ানী' জামাত সম্পর্কে বর্তমানে আপনাদের যে ধারণা, সে ধারণা পূর্বে আমাদেরও ছিল। আমরা সরাসরি আলোচনা করেছি, বই-পুস্তক পড়েছি, আল্লাহ্‌তাআলার নিকট দোয়া করেছি। 'কাদিয়ানী' জামাতের স্বপক্ষে নিদর্শন দেখার পর আর দেরী করি নি সকল বাধা উপেক্ষা করে এই জামা'তে বয়াত গ্রহণ করেছি। মৌলভী সাহেবের ওয়াজ আর ফতোয়া আমাদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি বরং বহু মৌলভী আমাদের কাছ থেকে জানার পর গোপনে এসে আহমদী হয়েছেন এবং হচ্ছেন।

এখন কেউ গালি দিলে অথবা কাফের বল্‌লে অথবা একঘরে করে দিলে অর্থাৎ কোন প্রকার নির্যাতন করলে ঐ সুখ পেয়ে থাকি, যেই সুখ প্রথম যুগের সাহাবীগণ পেয়েছিলেন। তারা যেমন নির্যাতন সহ্য করতে করতে প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছেন তবুও পিছ পা হননি। আমরাও তাই করছি। কারণ আমরা জানি সত্যের সাথে বিরোধিতা হয় এবং সত্যকে আল্লাহ্‌ জয়ী করে দেখান। তাই আপনাদেরকেও আহ্‌বান জানাচ্ছি, সরাসরি এসে আলাপ করে দেখুন, প্রশ্ন করুন, জবাব শুন্‌লে হয়ত অনেক ভুল ভেঙ্গে যাবে।

আপনারা বলে থাকেন ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এখনও আসেন নি, কিন্তু আসবেন। আর আমরা বলি এসে গেছেন। তার কারণ মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, ইসলামের উৎকৃষ্ট সময় হল তাঁর উপস্থিতিতে যেই শতাব্দী তারপর তাবেঈনের শতাব্দী তারপর তাবে তাবেঈনের শতাব্দী। এই তিন শতাব্দী অর্থাৎ তিনশত বছর ইসলামের সৌন্দর্য থাকবে। তারপর এক লম্বা দিন আসবে যা তোমাদের গণনায় হাজার বছর। একদিনে তা উঠে যাবে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা লোপ পেতে থাকবে। মারামারি কাটাকাটি বৃদ্ধি পাবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার প্রচলন হবে। মদের

ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। গায়িকা নারী ও বাদ্য যন্ত্রের প্রভাব বাড়বে, সমাজের নেতা দুর্নীতিপরায়ণ হবে, ব্যবসায়ীর মধ্যে ঈমানদারীর অভাব হবে। উট বেকার দেখতে পাবে অর্থাৎ উটে চড়ে মানুষ দূর দেশে ভ্রমণ করবে না। তাদের মসজিদগুলো হবে বাহ্যিক চাকচিক্যপূর্ণ কিন্তু ভিতর থাকবে হেদায়াতশূন্য। কুরআনের শুধু অক্ষরগুলো থাকবে যা পাঠে মানুষের মর্ম স্পর্শ করবে না। অর্থাৎ আখেরী জামানার লক্ষণসমূহ দেখা দিবে।

তখন দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। দাজ্জাল বলতে ঐ জাতিকে বুঝানো হয়েছে, যেই জাতি শিরক করে অর্থাৎ বলে আল্লাহ্‌র স্ত্রী আছে, পুত্র আছে। দাজ্জালের ডান চক্ষু অন্ধ থাকবে বলতে বুঝানো হয়েছে সেই জাতির আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থাকবে না, দুনিয়ামুখী হবে। দাজ্জালের গাধা বলতে বর্তমান যুগের নূতন নূতন আবিষ্কৃত যানবাহন। যার কপালে চক্ষু থাকবে এবং চিৎকার অনেক দূর থেকে শুনা যাবে বলতে গাড়ীর লাইট এবং হর্নকে বুঝানো হয়েছে, যেমন মোটর সাইকেল থেকে শুরু করে রেলগাড়ী, জাহাজ, এরোপ্লেন ইত্যাদির মধ্যে লাইট রয়েছে যা দেখতে গাড়ীর চক্ষুতুল্য এবং এই লাইটের কারণে রাত্রিতে দেখা যায় ও চলাচল করা যায় আর হর্ন বাজালে অনেক দূর থেকে শুনা যায়। দাজ্জাল মৃতকে জীবিত দেখাতে পারবে বলতে বর্তমান যুগের টেলিভিশন ও ভি.সি. আরকে বুঝানো হয়েছে। এক কান থেকে আরেক কানের দূরত্ব সত্তর গজ লম্বা হবে বলতে টেলিফোন ওয়্যারলেসকে বুঝানো হয়েছে। এই সমস্ত জিনিস হুযূর (সাঃ)-এর জমানায় ছিলা না কিন্তু বর্তমান জমানাতে আবিষ্কৃত হয়েছে অথচ তিনি রূপকভাবে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন এই লম্বা দিনটির বর্ণনা।

সেই তিন শত বছর আর এই হাজার বছর মোট তেরশ' বছর শেষে চৌদ্দশত বছরের শুরুতে এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশ পেয়ে নিজেকে ইমাম মাহ্‌দী বলে ঘোষণা করবেন। যার নাম মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নামের সাথে মিল থাকবে এবং নিজেকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর গোলাম হিসাবে পেশ করবেন। তিনি পারশ্য বংশের লোক হবেন। এক ভগ্নীসহ যমজ জন্মগ্রহণ করবেন। দামেস্কের পূর্বদিকে শুভ্র মিনারার নিকটে আবির্ভূত হবেন। তিনি এত বেশী ধনরত্ন (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) নিয়ে আসবেন যে লোকে নিতে চাইবে না বরং চিনতে না পেরে কাফের আখ্যা দিবে ইত্যাদি বর্ণনা হুযূর (সাঃ) দিয়েছেন। তাই সরল প্রাণ লোকদের উদ্দেশ্যে বলছি, যারা কাদিয়ানী জামাত সম্পর্কে জানতে সত্যিই আগ্রহী। আপনারা একটু ভাবুন, চিন্তা করুন এবং আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করুন।

পরিশেষে বুখারী শরীফের কিতাবুত্ তফসীর থেকে একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিচ্ছি: আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা যখন আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম ঠিক সেই সময়ে সূরা জুমু'আ অবতীর্ণ হইল আমি রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে জানিতে চাহিলাম যে, এই সূরাতে উল্লিখিত 'তাহাদের অন্যদল যাহারা এখনও আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই' সেই অন্য দল কাহারা? সালমান ফারসীও আমাদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি বার বার এই একই প্রশ্ন উত্থাপন করায়, হুযূর আকরাম (সাঃ) সালমান ফারসীর উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, 'ঈমান যদি সপ্তর্ষি মণ্ডলেও উঠিয়া যায় তথাপি ইহাদের (পারস্য বংশীয়দের) এক ব্যক্তি নিশ্চয় তাহা ফিরাইয়া আনিবে।'

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! দেখুন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা পারস্য বংশীয় ছিলেন। বলা হয়েছে, তিনি এসে এমন একটি দল বা জামাত গঠন করবেন, যেই দল আখেরী জমানার উম্মতের মধ্য থেকে হবে। কিয়ামতের দিন হুযূর পাক (সাঃ)-এর সাহাবীদের সাথে মিলিত হবে। কথাটির গুরুত্ব এবং তাৎপর্য একবার ভেবে দেখেছেন কি? তাইতো রসূল করীম (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনের সংবাদ পাওয়া মাত্র বরফের পাহাড় হামাগুঁড়ি দিয়ে হলেও গিয়ে তার হাতে বয়াত নেওয়ার জন্য এবং হুযূর পাক (সাঃ)-এর সালাম পৌছানোর জন্য।

কারণ তিনি আসবেন হুযূর পাক (সাঃ)-এর গোলাম হিসাবে এবং জ্ঞান লাভ করবেন আল্লাহ্‌তাআলার নিকট থেকে, আর উদ্ধার করবেন হুযূর পাক (সাঃ)-এর উম্মতকে। যখন উম্মত সঠিক ইসলাম থেকে সরে গিয়ে এক শ্রেণীর মৌলভীদের কাল্পনিক ইসলামে হাবুডুবু খেতে থাকবে।

এই জন্যই হুযূর পাক (সাঃ) বলেছিলেন, আমার উম্মতের মধ্যে যারা ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে পাবে তারা কতইনা সৌভাগ্যবান হবে। যারা ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে পেয়েও চিনতে না পারার কারণে গ্রহণ করার সৌভাগ্য পাবে না তাদের উদ্দেশ্যে কবির ভাষায় বলছি :

হৃদয় চিরিয়া দেখাইতে নারি
কেমনে বুঝাইব হায়,
যা বলিতে চাই শুনিবে না তাই
মোল্লাদের কথায়।।

–মোহাম্মদ আজিজুল হক

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

আমার নাতী ডাঃ রফিক আহমদ ভুঁইয়া, প্রভাষক-ফিজিওলজি, এস, এস, এম, সি, ঢাকা, এই বৎসর আই. পি. জি. এম. এন্ড আর এ অনুষ্ঠিত এম. ডি./ এম. এস কোর্সের ভর্তি-পরীক্ষায় এম. ডি. (গেষ্ট্রোএনটেরোলজী)-তে প্রথমস্থান অধিকার করেছে। আমাদের দেশে এই প্রথম একজন আহমদী সন্তান "ডক্টর অব মেডিসিনঃ ডিগ্রী অর্জন করতে যাচ্ছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

আমার আর এক নাতনী রাশেদা জহুরা এই বৎসর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে অনার্সসহ এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

আমার ছেলে মোদাব্বের আহমদ এবং মেয়ে নীনা আহমদ সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বর্তমানে কানাডায় হেলিফেকস্ ইউনিভার্সিটিতে এম ফিল এ সফলতা লাভ করে পি. এইচ. ডিতে অধ্যায়নরত আছে।

তাদের সু-স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং কর্মজীবনে সফলতার জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

ডাঃ আহমদ আলী
প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট,
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়া।

অষ্ট্রেলিয়ায় আহমদীয়ত

অষ্ট্রেলিয়া একটি দেশ। আবার ক্ষুদ্র হলেও একটি মহাদেশ। দু'কোটির মত লোক এদেশের বাসিন্দা। এবোরোজিন হলো এ দেশের আদি বাসিন্দা। তাদের সৎ গুণ হলো তারা বড়দের অতি সম্মান করে। চলাফেরা, পানাহারে ও আলাপ-আলোচনায় তাদের একটা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ একত্রে ভোজ হলে তাদেরকে কিছু পাঠ করতে দেখেছি। তারা মনে করে যে, তাদের জাতীয় ইতিহাস চল্লিশ হাজার বছর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। আমরা যখন হযরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবীর একটি স্বপ্ন তাদের নিকট বর্ণনা করি যে, তিনি একবার স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছেন। স্বপ্নের মধ্যেই একজন লোক তাঁর সম্মুখে এসে দেখা দিলেন এবং নিজেকে তার পূর্ব-পুরুষ বলে পরিচয় দিলেন। ইবনে আরাবী জিজ্ঞেস করলেন, আপনার মৃত্যু কবে হয়েছে। ইবনে আরাবী বললেন, আদম (আঃ) হতে আমাদের বর্তমানকাল পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয়েছে, এই দীর্ঘ সময়তো তার চেয়েও অনেক বেশী। ঐ ব্যক্তি বললেন, "তুমি কোন আদমের কথা বলছ? তোমার সর্বনিকটবর্তী আদমের কথা, না অন্য কোন আদমের কথা?' ইবনে আরাবী বলছেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি হাদীস তাঁর মনে পড়ল, যার মর্ম হল, "আল্লাহ্ এক লক্ষেরও বেশী আদমকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।" তখন আরাবী নিজে নিজে বল্লেনঃ এই ব্যক্তি যিনি আমার পূর্ব-পুরুষ হবার দাবী করছেন, তিনি নিশ্চয় পূর্ববর্তী আদমগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন (ফতুহাতে মক্কীয়া, ২য় খণ্ড) এসব কথা শুনে তারা তখন খুবই আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার এই আদি অধিবাসীরা অত্যাচারে জর্জরিত। বর্তমানে তাদের জন্য ভাল আবাসিক স্থান থাকলেও এখনও তারা উন্মুক্ত স্থানে বসবাস করাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

ক্যাপটেন কুক অষ্ট্রেলিয়ার যাবার জলপথ আবিষ্কার করার পরে ইংরেজগণকে সেখানে আবাদ করা হয়। বর্তমানে তারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোকই এদেশে বসবাস করে। বর্তমানে চীনরাই অধিক এবং ক্রমশঃ তাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে। তবে যে যাই বলুক না কেন এই ভিন দেশীরা অষ্ট্রেলিয়ার উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। অষ্ট্রেলিয়ার ৬টি প্রদেশ যথাক্রমে নিউ সাউথ ওয়েল্‌স রাজধানী ও বড় শহর সিডনী ভিক্টোরিয়া। রাজধানী ও বড় শহর মেলবর্ন। কুইন্সল্যান্ড। রাজধানী ও বড় শহর ব্রিসবেন। নর্দান টেরিটরি। বড় শহর ও রাজধানী ডারবিন। ওয়েস্টার্ন অষ্ট্রেলিয়া। বড় শহর ও রাজধানী পার্থ। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী ও বড় শহর এডেলাইড। টাসমানিয়া রাজধানী ও বড় শহর হোর্বাট। কমনওয়েলথ অফ অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী পাহাড় ঘেরা, অতি মনোরম ও সুন্দর শহর ক্যালবেরা। সবগুলো শহরই সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত। এখনও কুইনের আধিপত্য এবং তাহার প্রতিনিধি গর্ভনর জেনারেল রাষ্ট্রপ্রধান। তবে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার।

অষ্ট্রেলিয়ায় প্রথম আহমদী আগমন করেন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। হযরত সুফী হাসান মূসা খাঁ নামে একজন উটের মালিক ছিলেন। ইংরেজরা যখন নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় চাষাবাদ ও পথঘাট, রেলপথ নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করে তখন আফগানদেরকে উটসহ এ কাজের জন্য নিয়ে যায়। তাদের সাথে সুফী সাহেবও সেখানে পৌঁছেন। হযরত সুফী হাসান মূসা সাহেব মসজিদ নির্মাণ এবং

মাওলানা মাহমুদ আহমদ, আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, জামাত আহমদীয়া, অষ্ট্রেলিয়া

মুসলমানদের অপরাপর হিতকর কার্যে বলিষ্ঠ ভূমিকা ও অবদান রাখেন। তিনি মোহামেডান সোসাইটির সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি পার্থের মসজিদের জন্য তখন এক হাজার শিলিং চাঁদা পেশ করেন। সুফী সাহেব একজন অষ্ট্রেলিয়ান ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করেন। দুঃখের বিষয় তার সন্তানগণ অল্প বয়সেই মারা যায়। হযরত সুফী সাহেবের ভাতিজাগণ সবাই মেলবর্নে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

সুফী সাহেব খুবই কর্মঠ এবং উৎসাহী আহমদী ছিলেন। নিয়মিত চাঁদা, এবং তবলীগের রিপোর্ট কাদিয়ানে পাঠাতেন। জনাব আবদুল হক নামে একজন অষ্ট্রেলিয়ান মুসলমান কাদিয়ান আগমন করেন এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে তার যে আলাপ-আলোচনা হয়, মলফুযাতে তা প্রকাশিত হয়েছে।

জনাব ডাঃ এযাজুল হক সাহেব (লাহোর ডেন্টাল কলেজের প্রাক্তণ অধ্যক্ষ) ১৯৬৪ সালে কমনওয়েলথের বৃত্তি পেয়ে সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদেন। পরে তিনি স্থায়ীভাবে সিডনীতে বসবাস আরম্ভ করেন। তাহার স্ত্রী ডাঃ ফাহিমা হকও একজন ডেন্টিস। ১৯৭৩ সালে ফিজির একজন আহমদী ব্যবসায়ী জনাব শামসুদ্দীন মরহুম অষ্ট্রেলিয়া হয়ে রাবওয়া আসেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের (রাহেঃ) সাথে সাক্ষাৎ করে অষ্ট্রেলিয়াতে জামাত সম্পর্কে আলাপ করেন। হযরত সাহেব তাকে ডাঃ এযাজ সাহেবের সাথে দেখা করার উপদেশ দেন। তিনি ফিজি ফেরার পথে অষ্ট্রেলিয়াতে ডাঃ সাহেবের সাথে দেখা করেন এবং শামসুদ্দীন সাহেব অষ্ট্রেলিয়া আসার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে শাদী খান নামে একজন

পাঞ্জাবী আহমদী অষ্ট্রেলিয়া আগমন করেন। ১৯৫২ সালে শাদী খান মরহুমের এক ছেলে আঃ গাফফার খাঁ অষ্ট্রেলিয়া আসেন। ডাঃ এযাজ সাহেব অনেক তালাশের পর এ পরিবারের খবর পান। ১৯৭৪-এ শামসুদ্দীন সাহেব, ডাঃ এযাজ সাহেব, আঃ গাফফার সাহেব ও তার এক আত্মীয় রানা মোহাম্মদ আমজাদ খান সেখানে জুমুআ ও বা-জামাত নামায আরম্ভ করেন। চাঁদা আদায় শুরু হয় এবং জমাত কায়েম করার জন্য কেন্দ্র হতে অনুমতি লাভ করেন। হযরত খলীফা সালেস (রাহেঃ) অষ্ট্রেলিয়াতে নিয়মিত মিশন কায়েম ও জমি ক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন বর্তমানের ২৮ একর জমি নির্বাচন এবং ক্রয় করা হয়।

জুলাই ১৯৮৩ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অষ্ট্রেলিয়া সফরে যান এবং সিডনী শহর হতে প্রায় ৪০ কি: মি: পশ্চিম উত্তরে মার্সডেন (MARSDEN PARK) পার্কে মসজিদ বায়তুল হুদা'র ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৯৮ সালে জুলাই মাসে হুযুর এ মসজিদের উদ্বোধন করেন। জমি ক্রয়ের পর সেখানে টিনের একটি দোচালা ঘর নির্মাণ করা হয়। জনাব শাকিল আহমদ মুনীর সাহেব নাইজেরিয়ার সরকারী চাকুরী হতে অব্যাহতির পর ওয়াক্‌ফ করেন এবং সর্বপ্রথম অষ্ট্রেলিয়াতে আমীর ও মিশনারী হিসাবে ১৯৮৬ সালে গমন করেন। টিনের যে ঘরটি ছিলো তার একাংশ মসজিদ ও একাংশ তাঁর বাসস্থান ছিল। বর্তমানের যে বিরাট ও সুন্দর মসজিদটা দেখা যাচ্ছে তা তখনকার কয়েকটি পরিবারের পরিশ্রমের ফল। তবে এ কথা সত্য যে, মসজিদের নির্মাণকাজে জনাব শাকিল আহমদ ও মিসেস নঈমা মুনীরের বিরাট অবদান রয়েছে। তারা দুজনেই দিনরাত পরিশ্রম করেছেন। তাদের সাথে ছোট্ট জমাতের ছোট বড় সবাই এবং ভিনসেন্ট ফ্রিড সাহেব (হল্যান্ডের একজন আর্কিটেক্‌ট) যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। ভিনসেন্ট এখনও জমাতের কাজে নিয়মিত অংশ নেন। বিনা পয়সায় সব কাজ করেন। তিনি এখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম জাযা দান করুন। কেন্দ্র হতে মসজিদের নক্‌শা ও সকল প্রকার আর্থিক সাহায্য দান করা হয়েছে। মসজিদের অতি নিকটেই মিশন হাউস নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের প্রধানতঃ তিনটি অংশ। ডানদিকে উপরের অংশে লাইব্রেরী, নীচে অফিসসমূহ – বামদিকের উপরে ও নীচে পুরষ ও মহিলাদের পাকশালা। মধ্যাংশ, উপর ও নীচের অংশ নামাযের স্থান। মসজিদ সংলগ্ন কাদিয়ানের মত মিনারাতুল মসীহ নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের সাথেই একশত গাড়ী রাখার জন্য কার পার্ক আছে এবং মসজিদ হতে সরকারী সড়ক পর্যন্ত এক কি: মি: পাকা রাস্তা আমাদের খরচেই তৈরী করা হয়েছে। আহমদীগণের ৪০% ফিজিয়ান, ৪০% পাকিস্তানী, ২০% অপরাপর দেশবাসী। আল্লাহ্‌র ফযলে অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী এবোরোজিন (Aborigin) আহমদীও আছেন এবং তারা নামায শিখেছে এবং পবিত্র কুরআন শরীফ পর্যন্ত পাঠ করা আরম্ভ করেছে। আর্থিক দিক দিয়ে অষ্ট্রেলিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ। অষ্ট্রেলিয়ার সকল প্রদেশেই আহমদী আছেন। ব্রিসবেন ও মেলবর্নে আমাদের মিশনারী ও মিশন আছেন। খাকসার ১৭ই জুলাই ১৯৯১ থেকে সেখানে জমাতের খেদমতে নিয়োজিত আছি।

অষ্ট্রেলিয়াতে ইসলামের দ্রুত উন্নতির জন্য আমি সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

মাওলানা মাহমুদ আহমদ
আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ
জামাত আহমদীয়া, অষ্ট্রেলিয়া

১/২/৯৮

বায়তুল হুদা, সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ৩০/৯/১৯৮৩, উদ্বোধন ১৪/৭/১৯৮৯

ইনকিলাবে হাকীকী

(প্রকৃত বিপ্লব)

মূলঃ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(১৪তম কিস্তি)

ইব্রাহীমি আন্দোলনের বাণী ঃ

অতএব এরূপ যুগে, যা কিনা পরিপূর্ণ তৌহীদপন্থীর যুগ, যেহেতু তিনিই– মা কানা মিনাল মুশরেকীন বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্যতা রাখতেন এজন্যে হযরত ইব্রাহীম আলায়হেস সালামের ব্যাপারে এ কথা ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত নূহ আলায়হেস সালামের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়নি। নচেৎ এই উদ্দেশ্য নয় যে, নূহ (আঃ) উচ্চ স্তরের তৌহীদপন্থী ছিলেন না। সুতরাং দেখে নাও হযরত ইব্রাহীম আলায়হেস সালাম সম্বন্ধে কুরআন করীমে পাঁচ বার উল্লেখ এসেছে। আর পাঁচটি স্থলেই– ওয়ামা কানা মিনাল মুশরেকীন বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু নূহ (আঃ)-এর প্রসঙ্গে এ কথা আসে নি। যদ্বারা বুঝা যায় যে, স্বীয় যুগে যেন নূহ (আঃ) শিরকের সাথে মোকাবেলা করেছেন। কিন্তু যেহেতু পরিপূর্ণ শিরকের ঐ সময়ে সাধারণভাবে বিকাশ ঘটেনি এজন্যে– ওয়া মা কানা মিনাল মুশরেকীন-নামে তাঁকে ডাকার প্রয়োজন হয়নি। কেননা, মূর্তিপূজার বোঝা থেকে দূরে সরে থাকা সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিই অবহিত ছিলো যে, তিনি অংশীবাদী নহেন। এর দৃষ্টান্ত এমনই যে, যেভাবে সুই দ্বারা সকল মেয়ে লোকই কাজ করতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক মেয়েলোককে দরজী বলা যায় না। কেননা, দরজীর জন্যে স্বীয় কৌশলে পারদর্শী হওয়া জরুরী, এভাবেই নূহ (আঃ)-এর প্রসঙ্গে আমরা বলে থাকি যে, তিনি শিরকের সাথে মোকাবেলা করেছেন। কিন্তু ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রসঙ্গে আমরা বলে থাকি যে, শিরকের মোকাবেলা তাঁর পেশা ও কৌশলে রূপান্তরিত হয়েছিলো। এজন্যে তাঁর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–ওয়ামা কানা মিনাল মুশরেকীন। মোট কথা ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগে বাহ্যিক শিরক বাদেও অন্য আর একটি মেধাভিত্তিক শিরক ও দর্শন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। এ সময়ে কেবল এই শিরকই ছিলো না যে, কতক লোক মূর্তির সামনে মাথা ঝুঁকাতো বরং ভালবাসা ও ঘৃণার সূক্ষ্ম পন্থাসমূহের ওপরে চিন্তা করে মানবীয় অনুভূতিসমূহ বহু উন্নতি করে গিয়েছিলো। আর তখন বাহ্যিক শিরক করা ছাড়াও মানুষ বুদ্ধিগতভাবে মুশরেক হতে পারতো। এ কারণেই আল্লাহ্তাআলা নূহ (আঃ)-কে ইহা বলেন নি যে, আসলিম– আত্মসমর্পণ করো, আর এর উত্তরে তিনি বলতেন- আসলামতু লি রব্বিল আলামীন-আমি সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালকের নিকটে আত্মসমর্পণ করলাম। বরং ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ্তাআলা বলেছিলেন-আসলিম অর্থাৎ আমি তোমাকে কেবল ইহাই বলি না যে, মূর্তি পুজা করো না বরং তোমাকে ইহাও বলছি যে, তুমি নিজের অন্তরের ধ্যান-ধারণাসমূহকেও সার্বিকভাবে আমার আনুগত্যে সমর্পন করো এবং ইব্রাহীম (আঃ) উত্তর দিয়েছিলেন- আসলামতু লি রব্বিল আলামীন (সূরা বাকারাঃ ১৩২ আয়াত)। অর্থাৎ হে খোদা! আমার দেহের অনু-পরমানু তোমার সমীপে উৎসর্গীত। আমার বুদ্ধি, আমার জ্ঞান, আমার মস্তিষ্ক সব কিছুই তোমার হুকুমের দাস আর আমার সর্বপ্রকার শক্তি ও সর্বপ্রকার সামর্থ্য তোমার রাস্তায় নিয়োজিত। এজন্যেই তাঁর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-ওয়ামা কানা মিনাল মুশরেকীন– ইহাই ঐ তৌহীদ ও একত্ববাদ যাকে আস্থাস্থাপনকারী তৌহীদ বলে। আর প্রকৃত পক্ষে তৌহীদ উহাই হয়ে থাকে যা কিনা আস্থাশীল হয়। যখন মানুষ ইহা বলতে থাকে যে, আমার সব কাজ শেষ, এখন আমার খাওয়া, পান করা, আমার উঠা-বসা, আমার ঘুমান, আমার জাগরিত হওয়া, আমার মৃত্যু বরণ করা, আমার বাঁচা সবই খোদার উদ্দেশ্যে। সুতরাং দেখে নাও এর পার্থক্য পরে কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নূহ (আঃ)-এর যখন প্লাবনের সময়ে বাঁচার প্রয়োজন দেখা দিলো তখন আল্লাহ্তাআলা তাঁকে বল্লেন, তুমি একখানা নৌকো তৈরী করো যাতে চড়ে তুমি ও তোমার সঙ্গীরা প্লাবন থেকে রক্ষা পাবে। আর খোদা তাঁকে নৌকা বানিয়ে দিলেন। কিন্তু যখন ইব্রাহীম (আঃ)-কে খোদা বল্লেন যাও, তোমার পুত্র ইসমাঈল (আঃ)কে বৃক্ষ-লতাহীন উপত্যকায় ছেড়ে আস। তখন তিনি তাকে এমন কোন নির্দেশ দেননি যে, তার খাওয়া ও পান করার জন্যে তাঁকে ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি তাকে মাত্র এ আদেশ প্রদান করলেন যে, যাও তোমার স্ত্রী ও তোমার ছেলেকে অমুক উপত্যকায় ছেড়ে আস। তাই তিনি গেলেন এবং হাজেরা ও ইসমাঈলকে পানি শূন্য তৃণভূমিতে ছেড়ে চলে আসলেন। আর তাঁর এ দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, যে খোদা তাদের ঘরে রিয্ক দিচ্ছিলেন তিনিই তাদেরকে এখানেও রিয্ক সরবরাহ করবেন। মোট কথা ইব্রাহীম (আঃ) নূহ (আঃ)-এর তুলনায় তওয়াক্কাল ও খোদার প্রতি আস্থার দিক থেকে উন্নততর মার্গে অবস্থিত ছিলেন। আর পরিপূর্ণ আস্থার মার্গই পরিপূর্ণ তৌহীদের মান হয়ে থাকে যা কিনা ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাধ্যমে মানবতার পরিপূর্ণতা :

এভাবে মানবতার পরিপূর্ণতাও ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাধ্যমে সাধিত হয়েছে। আর প্রকৃতপক্ষে মানবতার পরিপূর্ণতা ও তৌহীদের পরিপূর্ণতা এক ও অভিন্ন। যতক্ষণ পর্যন্ত তৌহীদে পরিপূর্ণতা না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত মানবতা পরিপূর্ণ হতে পারে না। এজন্যে সুফীগণ বলেছেন-মান আরাফা নাফসাহূ ফাকাদ 'আরাফা রব্বাহূ অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেকে নিজে চিনে নিয়েছে সে খোদাকেও চিনেছে। অতএব যেভাবে মানবীয় জ্ঞানের বিবর্তন ইব্রাহীমি (আঃ) যুগে সাধিত হয়েছে এবং ধর্মীয় দর্শন স্বীয় মাহাত্ম্য প্রদর্শন করতে আরম্ভ করেছে তেমনি মানবতার পরিপূর্ণতাও ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাধ্যমে হয়েছে অর্থাৎ মানুষকে অন্যান্য জিনিষ থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নির্ধারণ করা হয়েছে। আর নরবলীকে রহিত করে দেয়া হয়েছে। তাঁর (আঃ)

পূর্বে মানুষের জীবনের কোন মূল্যই দেয়া হতো না। যে মরে গেছে মরে গেছে। যে জীবিত আছে জীবিত রয়েছে। কিন্তু ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য করা হলো। তখন পর্যন্তও মানুষ-জানোয়ারেরও মধ্যে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপিত হয়নি। ধারণা করা হতো যে, উভয়েই খায় ও পান করে। উভয়েই সন্তান উৎপাদন করে। উভয়েই চলা-ফেরা করে। পার্থক্য কেবল এই যে, মানুষের মস্তিষ্কের উন্নতি সুস্পষ্ট। এ কারণেই ঐ সময় পর্যন্ত কুরবানীর জন্যে মানুষকে কখনও কখনও পেশ করে দেয়া হতো। কেননা, মানুষ ও জন্তুর মধ্যে এমন কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য মনে করা হতো না। কেবল এ অনুভূতি ছিলো যে, মানুষ অধিক মূল্যবান এবং জন্তু-জানোয়ার কম মূল্যবান। কিন্তু যখন ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগে লোকেরা একত্ববাদ ও তৌহীদকে বুঝে নিলো তখন খোদা বল্লেন, এখন তার কুরবানী হতে পারে না। কেননা, তখন ইহা জন্তু-জানোয়ার নয়। আর জীবনে তার সত্তার একটি উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। তাই ঐ মার্গে মানুষের পৌছার কারণে ইব্রাহীম (আঃ)-কে নবীদের পিতা বলা হয়েছে যেভাবে আদম (আঃ)-কে মানুষের পিতা বলা হয়েছে।

মোট কথা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগে পুনরুত্থানের সঠিক মাহাত্ম্য মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। আর এতদ্দ্বারা বলা হয়েছে যে, মানব-জীবন ঐশী নৈকট্য লাভ করার মাধ্যম। এজন্যে কেবল এ বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও তার কুরবানী ব্যতিরেকে গত্যন্তর নেই। তার অনর্থক কুরবানী স্বয়ং ঐ উদ্দেশ্যকে বিনাশ করে, যার জন্যে মানবকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন এখন কুরবানীর দর্শন বুদ্ধি-ভিত্তিক হয়ে গেছে– বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক নয়। যেমন, যুদ্ধে মানুষকে বলি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে যে, যাও এবং মৃত্যুবরণ করো। আর ঐ উপলক্ষ্যে যেমন এ প্রশ্ন উত্থাপিত হবে যে, নরবলী সিদ্ধ নয় তখন সাথে সাথে এ জবাবও মিলে যাবে যে, নগণ্যকে উচ্চ শ্রেণীর জন্যে উৎসর্গ করে দেয়া হয়। উচ্চ শ্রেণী নগণ্যের জন্যে কুরবানী করা হয় না। মোট কথা কুরবানীর দর্শনও বুদ্ধির অধীনে এসে যাবে, এবং কোন কোন অবস্থায় এ কুরবানী পেশ করা বৈধ বরং প্রয়োজনীয় হবে। এবং কতক অবস্থায় বৈধ নয়। আর এর সাথেই যখন এ ধারণা সৃষ্টি হয়ে গেলো যে, মানুষ সকল সৃষ্টির মধ্যে সেরা তখন এ ধারণা থেকে তাসাওউফ (সুফীবাদ)-এর যুগ ভিত্তি আরম্ভ হয়ে গেলো এবং মানুষ ইহা মনে করতে লাগলো যে, আমি এজন্যে সৃষ্ট হয়েছি যে, স্বীয় খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করি এবং তাঁর প্রিয় হই। অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ) থেকে সুফীবাদের জন্ম হলো। সুতরাং এই সময়ে কেবল ভিত্তি রচিত হয়েছিলো আর উন্নতি পরে হয়। আর এথেকে এ মনযোগ সৃষ্টি হয় যে, যখন সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, মানুষকে হত্যা করা যেতে পারে না এবং এর ভিত্তি এ বিষয়ের ওপরে রাখা হলো যে, মানুষকে এজন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন সে খোদার ভালবাসার পাত্রে পরিণত হয়। তখন প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি এ চিন্তায় নিয়োজিত হলো যে, সে খোদা-প্রেমিকের মর্যাদা লাভ করার জন্যে কীভাবে চেষ্টা করে আর এভাবে সুফীবাদের ভিত্তি রচিত হয়।

পরিপূর্ণ সভ্যতার ভিত্তি ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক রচিত হয়

যখন নরবলি রহিত করা হলো তখন উহা মানুষের মনকে এদিকেও ধাবিত করে দিলো যে, দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তু মানুষের সেবার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর যখন এ ধারণা সৃষ্টি হলো তখন সাথে সাথে ঐশী বিধানের প্রতি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর চিন্তাও আরম্ভ হয়ে গেলো এবং সভ্যতার চরম মার্গের প্রতি মানুষের দৃষ্টি ধাবিত হলো। অতএব মানব সভ্যতার চূড়ান্ত মার্গের পর্যায়ও সত্যিকার অর্থে ইব্রাহীমের (আঃ) যুগ থেকে আরম্ভ হয়। আসল কথা এই যে, এযুগের পূর্বে মানুষ কেবল একজন প্রেমিকের আকারে ছিলো। আর তার মস্তিষ্কে প্রেমাষ্পদ হওয়ার ধারণা সৃষ্টি করা যেত না। কেননা, তার অসম্পূর্ণ উন্নতিকে দেখে ভয় করা হচ্ছিলো যে, পাছে সে অলস ও অমনযোগী হয়ে না যায়। কেননা, তখনও তার মস্তিষ্ক সূক্ষ্ম দর্শনকে সহ্য করার যোগ্য ছিলো না। কিন্তু ইব্রাহীম (আঃ)-এর সময়ে সে উহার যোগ্য হয়ে গিয়েছিলো যে, তার ওপরে এ রহস্য উন্মোচিত করা হয়। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মানুষের ঐশী প্রেমাষ্পদ হওয়ার দর্শন পেশ করেন। আর যেহেতু প্রেমিক প্রেমাস্পদের প্রাণের বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া পসন্দ করে না এজন্যে তার কুরবানী রহিত করা হলো। সুতরাং ইহা সুফীবাদের প্রাথমিক পর্যায় ছিলো।

এভাবে ইব্রাহীম (আঃ)-এর জীবন-দর্শনের যুগ ছিলো মানুষের বোধির যুগ। কেননা, ঐ সময়ে মানুষের সামনে এ দৃষ্টিভঙ্গি রাখা হলো যে, এ জীবন অর্থহীন ও অযথা নয় বরং নিজ সত্তায় এক মহান আশিস এবং ভবিষ্যতে উন্নতিসমূহের জন্যে সম্পদ জমা করার মাধ্যম। (চলবে)

অনুবাদ-মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মহীস্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিক্হুম তাস্হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত

ধর্মের নামে রুসুম-রেওয়াজ ও কদাচার

ইসলাম আমাদের দিয়েছে সর্বোৎকৃষ্ট জীবন-বিধান। ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে আল্লাহ্‌তাআলার প্রকৃত ইবাদত। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার লক্ষ্যে ইসলাম আমাদের দিয়েছে সুষ্ঠু পথ-নির্দেশনা। ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছে কীভাবে বান্দা আল্লাহ্‌তাআলার সাথে তার সম্পর্ক নিবিড় হতে নিবিড়তর করতে পারে।

বিগত চৌদ্দশত বৎসরে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা আমল করে বহু মু'মিন ওলী-আল্লাহ্, গাউস-কুতুব ও মনীষীতে পরিণত হয়েছেন। ইসলাম পৃথিবীতে এক নূতন সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু চৌদ্দশত বৎসর পরে সমস্ত মুসলিম জাহানকে তথা গোটা দুনিয়াকে নৈতিক অবক্ষয় গ্রাস করে ফেলেছে। মুসলমানরা ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেক ফেরকার লোকই ইসলামের নামে অনেক রুসুম রেওয়াজের (কদাচার-অনুষ্ঠানের) প্রবর্তন করেছে। প্রকৃত ইসলামের সাথে এসব রুসুম- রেওয়াজের দূরতম সম্পর্কও নেই। এ প্রবন্ধে আমরা কিছু রুসুম-রেওয়াজ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

মিলাদ মাহফিল

এ উপমহাদেশে বহুল প্রচলিত একটি রুসুম হলো মিলাদ মাহফিল। এ মিলাদে যদি কেবলমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর জীবনী নিয়ে আলোচনা হতো, তাঁর (সাঃ) উপর দরূদ পড়া হতো তবে মিলাদ নিয়ে আপত্তি উঠানোর কোন কারণ থাকেতো না। কিন্তু মিলাদের নামে যা করা হয় তা আপত্তিজনক। কথাটা বুঝিয়ে বলা যাক। এ ঢাকা শহরেই কোন না কোন জায়গায় প্রায় সারা রাত ধরে অতি জোরে মাইকের সাহায্যে সমবেত কণ্ঠে উচ্চস্বরে মিলাদ পড়ানো হয়। এমন এলাকায় বহু গৃহেই রুগ্ন মানুষ থাকতে পারে, অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি থাকতে পারে, শিশুতো থাকতেই পারে। এদের সকলের রাত্রে ঘুমের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সমবেত কণ্ঠের উচ্চস্বরের দরুন এদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। বাসা-বাড়ীতে ছাত্র-ছাত্রী থাকতে পারে। তাদের স্কুলের পড়া শিখতে হয়। মাইকের তীব্র আওয়াজে তারা তা করতে পারে না। এলাকায় অমুসলমান থাকতে পারে। আমার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দরুন তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানো কি সমীচীন?

মিলাদ মাহফিল এমন একটি রুসুমে পরিণত হয়েছে যে, এমনকি যারা নামাযের ধারও ধারেণা তারাও গৃহে কারো অসুখ-বিসুখ হলে, কোন বিপদে পড়লে, বা বিশেষ কোন আনন্দের ব্যাপার ঘটলে মাওলানা- মৌলবী সাহেব ডেকে মিলাদের ব্যবস্থা করেন। মিলাদ যেন ধর্মের অংগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর বহু মুসলমান দেশেই মিলাদ মাহফিলের রেওয়াজ নেই। এ উপমহাদেশেই এটা খুব জোরালো।

যিক্‌র

যিক্‌রের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্‌তাআলার প্রকৃত প্রেমিকে পরিণত হয়। এতে করে বান্দার আধ্যাত্মিকতার ক্রম বিকাশ ঘটতে থাকে। নামাযই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র। বান্দা যখন রাতের গভীরে বা দিনের বেলায় নির্জনে নিভৃতে তার প্রভুর দরবারে সেজাদাবনত হয়, মনের সমস্ত আকুতি-মিনতি নিয়ে চোখের জলে প্রভুর দরবারে আবেদন জানায় তখন তিনি তার অতি নিকটে এসে যান। তার ডাক শুনেন। তার হৃদয়কে পবিত্র করেন। তাকে আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে পূর্ণ করে দেন। যিক্‌রের মাধ্যমে মানুষের মনুষ্যত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটতে থাকে। মানুষ আল্লাহ্‌র রঙে রঙীন হতে থাকে।

নামায ছাড়াও আরো যিক্‌র আছে। কিন্তু আজকাল যিক্‌রের নামে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা করা হচ্ছে তাকে কিছুতেই ইসলামী শিক্ষার গণ্ডীভুক্ত করা যায় না। আমার সাম্প্রতিক কালের অভিজ্ঞতার কথা বলছি। আমার বাসার পাশে ঢাকা শহরে মগ বাজারের কোন এক এলাকায় সারারাত ধরে মাইকের সাহায্যে বহুলোক সমবেত কণ্ঠে উচ্চস্বরে এক ধরনের বিশেষ উচ্চারণে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" যিকর করতে থাকে। কিছুদিন পর পরই এ যিক্‌র চলতে থাকে মাইক বাজিয়ে। মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান যে সকল সমস্যার সৃষ্টি করে এ ধরনের যিক্‌র ঠিক সে ধরনের সমস্যারই সৃষ্টি করে। বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। পাড়া প্রতিবেশীর সমস্যা সৃষ্টি করে এ ধরনের যিক্‌রে কি আল্লাহ্‌তাআলা সন্তুষ্ট হন? বিবেকবান মানুষের নিকট প্রশ্নটি রেখে এ আলোচনার এখানেই ইতি টানতে চাই।

শবে বরাত

অনেক মুসলিম দেশেই বিশেষ করে এ উপমহাদেশে শবে বরাত খুব আড়ম্বরের সাথে উদযাপন করা হয়। বিষয়টি বিতর্কিত। ১৯৮৩ সালে একবার আমাকে ভারতের হায়দ্রাবাদে যেতে হয়েছিল কোন একটি সেমিনার উপলক্ষ্যে। এ সেমিনারে আরব জাহানের অনেক মুসলমান জ্ঞানী-গুণী অংশ নিয়েছিলেন। তাদের অনেককেই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম শবে বরাত আরব জাহানে উদযাপন করা হয় কিনা। শবে বরাত কথাটি তারা বুঝতেই পারলো না। তখন আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম যে, শবে বরাতকে 'লায়লাতুল বরাত'ও বলা হয়, অর্থাৎ বরাতের রাত্রি বা ভাগ্য-রজনী। আমার কথা শুনে তারা অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো এবং বললো,- very funny thing! তারপর তারা যা বললো তার সার কথা এই যে, তারা শবে বরাতের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত নয়।

যাক শবে বরাত সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে কোন সঠিক উল্লেখ আছে কিনা – সে আলোচনায় যাব না। এটা একটা বিতর্কিত বিষয়। আমি শুধু একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শবে বরাতে হাজার হাজার টাকার বাজি পুড়িয়ে বাজির বিকট আওয়াজে রোগীদের, বৃদ্ধদের, শিশুদের বিশেষ করে হৃদরোগীদের হৃদয় কাঁপুনী ধরিয়ে কোন্ ইসলামের সেবা করা হচ্ছে? এ ছাড়া এতে রয়েছে

অর্থের অপচয়। অথচ রাস্তা-ঘাটে রোডে লেখা দেখতে পাই "অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।"

মাযার যিয়ারত

নিঃসন্দেহে মাযার যিয়ারত একটি পুণ্য কাজ। আমরা আমাদের বাবা-মা, দাদা-দাদী ও আপনজনদের মাযারে গিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করি তাদের মাগফেরাতের জন্য, জান্নাতুল ফেরদাউসে তাদেরকে উচ্চ হতে উচ্চতর মাকামে উন্নীত করার জন্য। আমরা পুণ্যাত্মা ও ওলী-আল্লাহ্‌গণের মাযারও যিয়ারত করি। উদ্দেশ্য একটাই। যারা মৃতগণের জন্য দোয়া করেন আল্লাহ্ তাদেরকেও নেকীর অংশীদার করেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল মাযার যিয়ারতের নামে কবর পূজা চলছে। কোন কোন মানুষ ওলী-আল্লাহগণের মাযারে মানত করে। তারা মাযারে ফির্‌নী বিতরণ করে। মাযারে টাকা দেয়। মোমবাতি জ্বালায়। কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ মাযারে সেজদাও করে। এ যুগে এক ধরনের মাযার-ব্যবসায়ীর সৃষ্টি হয়েছে। তারা জনগণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে রমরমা মাযার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এরা খাদেম নামে অভিহিত। প্রশ্ন হচ্ছে মৃতব্যক্তির কাছে জীবিত মানুষের কি কিছু চাওয়া-পাওয়ার আছে? মৃত মানুষ জীবিতকে কিছুই দিতে পারে না। কারণ তারা আল্লাহতাআলার নিকট ফিরে গেছে। দুনিয়ার সাথে সকল সম্পর্ক তারা ছিন্ন করেছে। বরং জীবিতরাই মৃতদেরকে কিছু দিতে পারে তাদের জন্য দোয়া করার মাধ্যমে, তাদের আত্মার মাগফেরাত চাওয়ার মাধ্যমে।

পা ছুঁয়ে সালাম বা কদমবুছি করা

অতি ভক্তিতে আমরা গুরুজনদেরকে ও সম্মানিত ব্যক্তিগণকে পা ছুঁয়ে সালাম করে থাকি। এটা এক ধরনের শির্‌ক। কারণ মু'মিন আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নিকট মাথা ঝুঁকাতে পারে না। কোন কোন পীরের আস্তানায় দেখা যায় মুরীদগণ অতি ভক্তিতে পীর সাহেবকে কেবল পা ছুঁয়ে সালামই করে না; বরং একেবারে সেজদা করে ফেলে। এটাতো শির্‌কের নামান্তর। পৃথিবীর সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানব ও রসূল হলেন আমাদের প্রিয় খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)। তাঁকে (সাঃ) কি কোন সাহাবী সেজদা করেছিলেন, বা পা ছুঁয়ে সালাম করেছিলেন? কুরআন-হাদীস বা ইতিহাস থেকে কী এর একটি প্রমাণও পাওয়া যাবে? তবে কী আমাদেরকে এ ধরনের শির্‌ক থেকে মুক্ত হওয়া উচিত নয়?

রোযার নামে বাড়াবাড়ি

রোযা ইসলামের ৫টি স্তম্ভের একটি স্তম্ভ। মু'মিনের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে। রোযা আমাদেরকে সংযম শিক্ষা দেয়, আল্লাহ্‌তাআলার সাথে আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে। হজ্জ যেমন শর্তসাপেক্ষ, রোযাও তেমনি শর্তসাপেক্ষ। সূরা বাকারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, তোমরা সফরে থাকলে ও পীড়িত অবস্থায় রোযা করো না। পরে অবশ্য এ রোযা পূরণ করে দিতে হয়। এমন বৃদ্ধ আছেন বা এমনতরো পীড়িত লোক আছেন, যাদেরকে চিকিৎসকগণ রোযা রাখতে নিষেধ করেন। তাদের জন্য ফিদিয়া দেয়া যথেষ্ট। কিন্তু গ্রামে-গঞ্জে দেখা যায় অনেকেই অসুস্থ অবস্থায়ও রোযা রাখেন। এমন কথাও কাউকে কাউকে বল্‌তে শুনা যায়, অসুখে মরে যাব তবুও রোযা ভাঙ্গবো না। রোযা মুখে নিয়েই মরবো। খোদার সুস্পষ্ট আদেশ অমান্য করে এ ধরনের লোকেরা খোদাকে জোর করে সন্তুষ্ট করাতে চায়। এ সব কিছুরই মূলে রয়েছে অজ্ঞতা।

হিলাহ্

রাগের মাথায় কেউ কেউ স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়ে থাকে। অতঃপর ফতোয়াবাজরা অসহায় ও অনুতপ্ত স্বামীকে হিলাহ্ পরামর্শ দিয়ে থাকে। হিলাহ্‌র অর্থ হলো স্বামীর সাথে দ্বিতীয়বার বিয়ের আগে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে-সংসারের ব্যবস্থা করতে হবে। ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ইংরেজী তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের "ফতোয়াবাজি এখন খোদ রাজধানীতেই" শিরোনামে হিলাহ্ সম্পর্কিত একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অথচ রাগের মাথায় এক সঙ্গে তিন তালাক দেয়ার কোন ব্যবস্থাই ইসলামে নেই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এ সবই করা হচ্ছে ইসলামের নামে। তবে এটা আশাব্যাঞ্জক যে, ধীরে ধীরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এ ব্যাপারে অনেকখানি সচেতন হয়ে উঠছে।

কুলখানি ও চেহলাম

আমাদের দেশে মৃতজনের আপনজনেরা তার মৃত্যুর চতুর্থ দিনে কুলখানি ও ৪০তম দিনে চেহলামের আয়োজন করে থাকেন। গরীব-মিসকীনকে খাওয়ানো নিশ্চয় উত্তম কাজ। কিন্তু মৃত্যুর চতুর্থ দিনে ও ৪০তম দিনে কুলখানি ও চেহলাম এর ন্যায় অনুষ্ঠানের আয়োজন ইসলামসম্মত কিনা অর্থাৎ কুরআন হাদীসে এ সম্পর্কে কোন দিক্ নির্দেশনা আছে কিনা তা অনুসন্ধান করে দেখার জন্য সুধীজনের নিকট বিনীত আবেদন জানাচ্ছি। এ জাতীয় অনুষ্ঠানাদি কবে থেকে মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করলো, কীভাবে করলো তা-ও সুধীজন অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন।

খত্‌না ও আকীকা

স্বাস্থ্যসম্মত কারণে শৈশবে আমরা বেটাছেলের খত্‌না করে থাকি। এটি একটি ইসলামী বিধান। কিন্তু খত্‌নাকে কেন্দ্র করে অনেক রুসুম-রেওয়াজের জন্ম হয়েছে। অনেক ধনী ব্যক্তি ছেলের খত্‌না উপলক্ষ্যে এত বেশী আনন্দ-উৎসব ও ভোজের আয়োজন করে থাকে, যা অর্থের অপচয় ও মিথ্যা আড়ম্বর ছাড়া আর কিছু নয়। পুরাতন ঢাকা শহরে খত্‌না এত ঘটা করে করা হয় যে, তা দেখলে রীতিমত চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

অনুরূপভাবে অনেকেই বিপুল আড়ম্বর, জাঁক-জমক ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সন্তানের আকীকা করে থাকেন। আকীকা ধর্মীয় বিধান। কিন্তু অর্থহীন আড়ম্বর ও অর্থের অপচয় নিশ্চয় ধর্মীয় বিধান নয়।

জীনের আসর

আপনারা শুনে থাকবেন বা দেখে থাকবেন গ্রামে-গঞ্জে কোন কোন মেয়ের উপর জীনের আসর হয়। আসরগ্রস্ত মেয়েটি অস্বাভাবিক আচরণ করতে আরম্ভ করে, আবোল তাবোল বলতে থাকে, এমনকি পাগলামী করতে শুরু করে। তখন মেয়েটির আপনজনেরা বা হিতাকাংখীরা পীর-ফকীর-ওঝা বা কোন পেশাদার তথাকথিত মৌলবীকে এনে মেয়েটির জীন ছাড়ায়।

প্রশ্ন হচ্ছে কুরআন করীমের সূরা জীন বা অন্যান্য সূরায় যে জীনের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে কী মেয়েদের উপর যে জীনের আসর হয় বলে বিশ্বাস করা হয়, এ কল্পিত জীনের সাথে তার কী কোন সম্পর্ক আছে? সূরা আন্‌আমে আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন, জীনের মধ্য হতে হউক বা মানুষের মধ্য হতে হউক যারা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় তাদের কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হতে আমরা যেন আল্লাহ্‌তাআলার আশ্রয় চাই। এ কুমন্ত্রণার শিকার নারী-পুরুষ উভয়ে হতে পারে। কেবল নারীদের উপর জীনের আসর হবে কেন? পুরুষদের উপরও হতে পারে। তাছাড়া জীনের আসর হলে আসরগ্রস্ত মেয়েটি কেন পাগলামী করতে থাকবে? জীনের কুমন্ত্রণার দরুন যে কোন অন্যায় কাজ করতে পারে, পাগলামী করতে পারে না। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, জীনের কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হতে বাঁচার জন্য তাঁর (আল্লাহ্‌তাআলার) আশ্রয় চাইতে। কোন পীর-ফকির ওঝা বা মৌলবীকে ডাকতে বলা হয়নি।

যাকে আমরা জীনের আসরগ্রস্ত মেয়ে বলি সে মূলতঃ কোন মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগী। এ রোগের ডাক্তারী চিকিৎসা আছে। ঝাড়-ফুঁক দেয়া, মেয়েটিকে মারধর করা বা তার নাকে পোড়া মরিচ ও চামড়ার জুতো ধরে রাখা এ রোগের চিকিৎসা নয়। প্রকৃত সত্য হলো, এ কল্পিত জীনের সঙ্গে কুরআন বর্ণিত জীনের কোন সম্পর্ক নেই। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। ধর্মীয় রুসুম-রেওয়াজ ও কদাচার অনুষ্ঠানের তালিকা আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। উল্লিখিত গুটি কয়েক উদাহরণই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যথেষ্ট বলে মনে করি।

নবীকুলের শিরোমনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়, বা খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে, বা ইসলামের প্রথম তিনশত বৎসরের স্বর্ণযুগে কী এসব আচার-অনুষ্ঠান ছিল? নিশ্চয় না। এগুলো পরবর্তী যুগে ধীরে ধীরে মুসলমানদের মধ্যে প্রবর্তন করা হয়েছে। পীরপূজা, কবরপূজা, তাবিয-কবযের ব্যবসা, ওয়াজ এর নামে, মিলাদের নামে অর্থোপার্জ্জন, ফকির সেজে নিরীহ জনগণের অর্থ লুটপাট, ঈদে, কুরবানীতে, জন্মদিনে, বিবাহ-সাদীতে, খত্‌না, আকীকা, ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অর্থহীন আড়ম্বর ও জাঁক-জমক – এ সবই যেন ধর্মের অঙ্গ হয়ে গেছে। প্রকৃত ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

ইসলাম আল্লাহ্‌তাআলার মনোনীত ধর্ম, সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ও শেষ ধর্ম এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বনবী। মানব সম্প্রদায়কে ইসলামের প্রকৃত জ্যোতিতে জোতির্ময় করতে এসেছিলেন। তা মানতে হলে আমাদেরকে এ সব ধর্মীয় কদাচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে প্রকৃত ইসলামের অনুসরণ করতে হবে। প্রকৃত ইসলাম কী? প্রকৃত ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ্‌তাআলার বাণী পবিত্র কুরআন, খাতামান্নাবীঈনে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সুন্নত ও তাঁর (সাঃ) হাদীসসমূহ। ইসলামের নামে পরবর্তীকালের সংযোজনসমূহ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা সকলের কর্তব্য নয় কি?

প্রবন্ধটির উপসংহারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি। ধর্মের নামে কদাচার-অনুষ্ঠানের নীচে যেন প্রকৃত ইসলাম বাধা পড়ে গেছে। এ দুর্বিসহ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কি? বিভিন্ন ফেরকার মধ্যে মত পার্থক্য এত বেশী যে, একদল অপর দলকে কাফের ঘোষণা দিতে দ্বিধা বোধ করে না। প্রত্যেক দলই দাবী করে তাদের ধর্ম বিশ্বাস, তাদের আচার-অনুষ্ঠানই প্রকৃত ইসলাম। প্রকৃত ইসলাম কোন্‌টি? কে এর মীমাংসা দেবে? এর মীমাংসা স্বয়ং হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই দিয়ে গেছেন। তিনি (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের (মুসলমানদের) মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা দেখতে পাবে ঈসা ইবনে মরিয়মকে ইমাম মাহ্‌দী এবং ন্যায়-বিচারক মীমাংসাকারীরূপে।" (মুসমাদ আহ্‌মদ বিন হাম্বাল, জিলদ ২, পৃষ্ঠা ৪১১)।

মহানবী (সাঃ)-এর এ হাদীস অনুযায়ী ১৮৮৯ ইং সালে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) দাবী করেন – তিনিই সেই প্রতিশ্রুত ঈসা ইবনে মরিয়ম ও ইমাম মাহ্‌দী। তাঁর অনুগামীদেরকে বলা হয় আহমদী মুসলমান। তিনি ইসলামের সকল ফিরকার মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ ও মতাবিরোধের ন্যায়-মীমাংসা দিয়ে গেছেন। ধর্মের নামে কদাচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কেও তিনি তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখে গেছেন। তিনি যে ইসলাম আমাদের সম্মুখে পেশ করছেন তা-ই প্রকৃত ইসলাম। কেননা, তিনি জাগতিক গুণী-জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণের ন্যায় নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা ও জ্ঞান থেকে কোন মীমাংসা দেননি। তিনি যে মীমাংসা দিয়ে গেছেন তা আল্লাহ্‌তাআলার নিকট থেকে পাওয়া ওহী-ইলহাম এর ভিত্তিতে দিয়ে গেছেন। পাঠকগণের নিকট বিনীত অনুরোধ আপনারা তাঁর পুস্তকাদি পাঠ করে তাঁর দাবী ও তাঁর বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করে দেখুন।

আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় তিনি ছোট বড় প্রায় ৯০ খানা পুস্তক প্রনয়ণ, ও প্রকাশ করেন এবং ৯০ হাজার পত্র লেখেন। তিনি পৃথিবীর রাজন্যবর্গ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট তাঁকে গ্রহণ করার জন্য নবীগণের সুন্নত অনুযায়ী ১৬ হাজার দাওয়াতী চিঠি লেখেন। একদিন তিনি ছিলেন একা এবং সমস্ত জগদ্বাসী ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু আজ জগতের সর্বত্র সকল জাতির মধ্যে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা অতিদ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে বাংলাদেশেও তাই হচ্ছে। এমনই হয়ে থাকে। সত্যের সদা বিরোধিতা হয়, তবু সত্যই জয়ী হয়।

–নাজির আহমদ ভূঁইয়া

আপনার পত্র পেলাম

ফ্যাক্স মারফত প্রাপ্ত

২৭-১-৯৮ ইং

আমীর সাহেব,

আপনার সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু, ও কল্যাণময় জীবনের জন্যে সব সময় দোয়া জারী রাখছি।

নিম্নে কয়েকটি বিষয়:

১। অদ্য পাক্ষিক আহমদী নূতন আঙ্গিকে ও মনোরম ছাপা এবং সাদা কাগজে পেলাম। জাযাকুমুল্লাহ্। কিন্তু ১৫ দিনে কখনও পাই না। ইহা কি মাসিকে পরিণত হয়েছে।

বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে জার্মানীর জন্য আমার নাম দেওয়াতে শুকরিয়া আদায় করছি। এদেশ থেকে সংবাদ পাঠাতে চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ্।

স্বাক্ষরিত: মোহাম্মদ আব্দুর রব, জার্মানী

পত্র মারফত

২৫-১-৯৮ ইং

আমীর সাহেব, পাক্ষিক আহমদী নূতন প্রকাশনা চমক লাগিয়েছে। বর্তমান পাক্ষিক আহমদী আসলেই উন্নতমানের সব দিক দিয়ে। আল্লাহ্ আপনার এই প্রয়াসকে বাস্তবায়ন করুন ও উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আপনাকেও যারা এর কাজে সহযোগিতা করছেন বিভিন্নভাবে সবাইকে উত্তম পুরস্কার আল্লাহ্ প্রদান করুন।

স্বাক্ষরিত: মৌঃ এস.এম. আব্দুল হক, মোয়াল্লেম।

খোদ্দামুল আহমদীয়া, বেলজিয়ামের তালীম ও তরবিয়ীতি ক্লাস সম্পন্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ ব্রাসেলস–২৮ শে ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং : সদর সাহেব মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বেলজিয়ামের সমাপনী ভাষণ ও পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে শেষ হলো ৬ষ্ঠ বার্ষিক তালীম ও তরবিয়ীতি ক্লাস। ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর এই তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ ক্লাসের উদ্বোধন করেন আমীর জনাব হামিদ মাহমুদ শেখ সাহেব, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন ওয়াসিফ আহমদ ভাট্টি ও এর বাংলা অনুবাদ পাঠ করেন বাংলাদেশী জনাব মাহফুজ উল্লাহ্ সিকদার। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বাংলাদেশের কৃতী সন্তান জনাব এন, এ, শামীম আহমদ। পরীক্ষায় বাংলাদেশীরা অভূতপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। প্রথম স্থান অধিকার করেন জনাব রকিবুল হক ও খাকসার।

মাহফুজউল্লাহ সিকদার, বেলজিয়াম

আরও যারা আকিকার জন্যে দোয়া চাইছেন

১। পিতা – জনাব ফযল আলী
সন্তান – আসীর

২। পিতা – মোসাদ্দেক আহমদ
সন্তান – ইমরান

৩। পিতা – জনাব আর. আহমদ করীম
সন্তান – রায়হান

ধানসিঁড়ির রান্না
আপনার ঘরের রান্না
ধানসিঁড়ির রান্না
একবার এসে খান্ না॥

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে
রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ
Dhansiri Restora
রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান
ঢাকা-১২১২
ফোন : ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

Our felicitations to the 74th National Salana Jalsa '98 of Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh

PRDUCER OF QALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

মোয়াল্লেমীন রিফ্রেসার ট্রেনিং কোর্সে অংশগ্রহণকারী মোয়াল্লেমদের মাঝে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সদস্যদের সাথে ন্যাশনাল আমীর মোহতারম আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার মজলিসে আমেলার সদস্যদের সাথে অস্ট্রেলিয়ার আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মোহতারম মাওলানা মাহমুদ আহমদ, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী ও ঢাকা জামাতের আমীর মীর মোবাশ্বের আলী সাহেব।

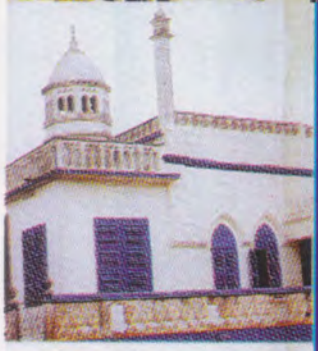

কানাডায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

উত্তর মেরুতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

আমেরিকায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে

আফ্রিকার ঘানায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)।
পাশে ঘানার আমীর মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব আদম এবং কেন্দ্রীয় মুরব্বীয়ান

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাং

খলীফাতুল মসীহ্-এর পদে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম ভাষণ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস'(রাহেঃ)-এর সাথে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (বর্তমান খলীফা- আইঃ)

দূরপ্রাচ্যে আন্তর্জাতিক সীমারেখায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে'(আইঃ)

দশ-এর ৭২তম সালানা জলসা

অস্ট্রেলিয়ায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে'(আইঃ), ইনসেটে বর্তমান আমির মাওলনা মাহ্মুদ আহমদ

ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদের সামনে সদর মুরব্বীয়ান, মেয়াল্লেমীন ও ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সদস্যগণের সাথে ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী ও হুজুর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেবকে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদের সামনে দাঈ'আনে ইলাল্লাহ্ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণের সাথে ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী ও ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সদস্যবৃন্দ

ছোটদের পাতা

রোযা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

(তৃতীয় কিস্তি)

মূল : মোহতরম আব্দুল মাজেদ তাহের, লণ্ডন

রোযার জন্যে নিয়্যত করা জরুরী

যে ব্যক্তির রোযা রাখার ইচ্ছা হয় তার অবশ্যই রোযা রাখার নিয়্যত করা উচিত। হযরত হাফসাহ (রাঃ) আঁ হযরত (সাল্লাঃ)- থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সাঃ) বলেন –

মাল্লাম ইয়াজমা'উস্ সাওমে ক্বাবলাল ফাজরে ফালা সিয়ামুলাহূ – যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পূর্বে রোযার নিয়্যত করে না তার জন্যে কোন রোযা নেই (তিরমিযী কিতাবুস্ সাওম বাবু লা সিয়ামু লেমাল্লাম ই'আয়ুম মিনাল লায়লে)।

ইসলাম কর্মসমূহের ভিত্তি নিয়্যত বা সংকল্পের ওপরে রেখেছে। আঁ হযরত (সাঃ) বলেন, আ'মালু বিন্নিয়্যত অর্থাৎ কর্মসমূহ মানুষের নিয়্যত ও ইচ্ছার ওপরে পরিব্যপ্ত। এজন্য ইসলামী ইবাদতসমূহ আরম্ভ করার জন্যেও নিষ্ঠা, নিয়্যত ও পুণ্য বাসনা শর্তযুক্ত। এ কথাই রোযা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, উহার জন্যে নিয়্যত করা আবশ্যক। উৎকৃষ্ট পদ্ধতি ইহাই যে, মানুষ রাতে রোযা রাখার ইচ্ছা করে এবং নিয়্যত করে ঘুমায়।

রোযার নিয়্যত করার জন্যে কোন নির্ধারিত বাক্য মুখে আওড়ানো জরুরী নয়। নিয়্যত আসলে অন্তরের বাসনা ও ইচ্ছার নাম যে, সে কি কারণে খাওয়া ও পান করা পরিত্যাগ করে। রোযার নিয়্যত সুবহে সাদেক অর্থাৎ ফজরের আগে করা উচিত (সূর্য-উদিত হওয়ার কমপক্ষে সোয়া ঘন্টা দেড় ঘন্টা পূর্বে –অনুবাদক)। অবশ্য যদি কোন ওজর-আপত্তির সম্মুখীন হয় যেমন, তার জানা ছিলো না যে, আজ রমযান আরম্ভ হচ্ছে বা ঘুমিয়ে ছিলো, সকালে ঘুম থেকে জাগলে পরে মনে পড়লো যে, আজ তো রোযা বা এ ধরনের আরও কোন কারণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে রোযা রাখার জন্যে দুপুরের আগে ভাগেই ঐ দিনের রোযার জন্যে নিয়্যত করা যাবে। শর্ত এই যে, ফজরের সময়ের পর থেকে কিছু খাওয়া পান করা হয়নি।

একটি হাদীসে আছে যে, একবার দুপুরের আগে খবর পাওয়া গেল যে, কাল মদীনার শহরতলীর কোন গ্রামে রমযানের চাঁদ দেখা গিয়েছিলো। এর ওপরে হুযূর (সাঃ) বলেন, "যে সকাল থেকে কিছু খায়নি বা পান করেনি, সে রোযার নিয়্যত করে নিক এবং যে কিছু খেয়েছে বা পান করেছে সে পরে এ রোযা কাযা করবে বা রেখে নিবে" (সুনানে আবূ দাউদ কিতাবুস্ সিয়াম বাবু কি শাহদাতুল ওয়াহেদ আলা রু'ইয়াতে হেলাল রামযানা)।

* .... নফল রোযার জন্যে দিনের বেলায় দুপুরের আগে আগে রোযার নিয়্যত করা যায়। (তবে শর্ত এই যে, নিয়্যত করার সময় পর্যন্ত কিছু না খেয়ে থাকতে বা না পান করে থাকতে হবে) হাদীসে এসেছে – ইন্নাহু (সাল্লাঃ) কানা ইয়াদখুলু 'আলা বা'যি আযওয়াজিহি ফাল ইয়া'কূলু হাল মান গাদায়ে ফাইন্না ক্বলূ ইল্লা ক্বলা ফাইন্নী সায়েমুন অর্থাৎ হুযূর (সাল্লাঃ) কখনও ঘরে আগমন করতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন যে, নাশ্‌তার জন্যে কিছু আছে কি? যদি এ জবাব আসতো যে, কিছু নেই তাহলে তিনি (সাঃ) বলতেন, বেশ্ আজ আমি রোযা রেখে নিলাম (সহীহ মুসলিম কিতাবুস্ সাওম বাবু জওয়াযে সাওমু ন্নাফিলাতা বে নিয়্যাতিহি মিনান্নাহারে)।

এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, যদি ফজরের পূর্বে নিয়্যত করাতে কোন কারণের সৃষ্টি হয় তাহলে দিনের বেলায়ও নিয়্যত করা যায়। সুতরাং হুযূর (সাল্লাঃ)-এর এ রোযা ছিলো নফল রোযা।

*..... হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তি প্রশ্ন উত্থাপন করলো যে, আমি বাড়ীর ভিতরে বসা ছিলাম আর আমার এ দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে. এখনও রোযা রাখার সময় আছে এবং আমি কিছু খেয়ে রোযার নিয়্যত করি। কিন্তু পরে অন্য এক ব্যক্তির নিকট জানতে পারি যে, ঐ সময় শুভ্র রেখা প্রকাশিত হয়েছিলো। এখন আমি কি করি? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "এমতাবস্থায় তার রোযা আদায় হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার রাখার প্রয়োজন নেই। কেননা, নিজের পক্ষ থেকে তিনি সাবধানতা অবলম্বন করেছেন এবং নিয়্যতের মধ্যে কোন তারতম্য নেই" (আল্ বদর, ১৪-২-১৯০৭ইং)।

সেহরীর আদব-কায়দা

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সাল্লাঃ) বলেন, "তাসাহ্হারূ ফা ইন্না ফিস্‌সুহূরে বারাকাতান" অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! সেহরী খাও। কেননা, সেহরী খাওয়ার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে (মুত্তাফিক আলায়হে)।

'আস সাহূর' শব্দটি 'সেহরুন' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ হলো প্রভাত, আর 'আস্ সাহূর' শব্দটি প্রভাতে খাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। ইহুদীদের রোযার সেহরী ছিলো না; কিন্তু মুসলমানদের সেহরী খাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে আঁ হযরত (সাল্লাঃ) বলেছেনঃ

'ফাসলু মা বায়না সিয়ামিনা ওয়া সিয়ামি আহলিল কিতাবি উকলাতুস্ সাহারি" অর্থাৎ আমাদের রোযা ও আহলে কিতাবের (ইহুদী ও খৃষ্টান) রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সেহরী খাওয়া (সহী মুসলিম ও সুনানে দারিমী, কিতাবুস্ সাওম, বাব ফযলুস্ সাহূর)।

*..... অর্থাৎ মুসলমানগণ সেহরী খেয়ে রোযা রাখতেন আর আহলে কিতাব সেহরী খেতো না। সেহরী খাওয়ার সময় অর্ধেক রাত্রের পর থেকে ফজরের সময় হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু অর্ধেক রাত্রে উঠে সেহরী খাওয়া সুন্নতের বিধান নয়। আসল কল্যাণ নবী করীম (সাল্লাঃ)-এর সুন্নত ও রীতি-নীতির মধ্যে। আর সুন্নত হলো এই যে, ফজরের সময় হওয়ার কিছু পূর্বে মানুষ খেয়ে নেয় পান করে নেয়। আঁ হযরত (সাল্লাঃ) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামেরও এ রীতি ছিলো। সাহারায়ে কেরাম (রাঃ) বলেন:

"তাসাহ্হারনা সুম্মা কুমনাইলাস্ সালাহ্"

অর্থাৎ সেহরী খাওয়ার পরে আমরা নামাযে দাঁড়িয়ে যেতাম

(তিরমিযী, কিতাবুস্ সাওম বাব তা'খায়েরউস্ সাহূর)।
অর্থাৎ সেহরী শেষ হওয়া এবং ফজরের নামাযের মধ্যে খুব কম সময়ই বিরতি থাকতো।

*..... হযরত আনাস হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা আঁ হযরত (সাল্লাঃ)-এর সাথে সেহরী খেলাম পরে ফজরের নামাযের জন্যে দাঁড়িয়ে গেলাম। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, সেহরী ও ফজরের নামাযের মধ্যে কত সময় বিরতি থাকতো। এতে হযরত যায়েদ বিন সাবেত বল্লেন যে, কমপক্ষে (কুরআনের) ৫০টি আয়াত পড়তে যতটুকু সময় লাগে।
(বুখারী, কিতাবুস্ সাওম, বাব কাদারকুম বায়নাস্ সাহূরে ও সালাতিল ফাজরে)
অর্থাৎ আনুমানিক দশ/পনর মিনিট। ৫০টি আয়াত তেলাওয়াত করতে কমপক্ষে এতটা সময় লাগে।

*..... হযরত সাহীল বিন সা'আদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিজের ঘরে সেহরী খেয়ে আমাকে শীঘ্র গিয়ে ফজরের নামাযে রসূল করীমে (সাল্লাঃ)-এর সাথে যোগদান করতে হতো (বুখারী কিতাবু মাওয়াকিয়াতুস্ সালাত বাব ওয়াকতিল ফাজরে)।

*..... সেহরীর প্রতি জোর দিতে গিয়ে আঁ হযরত (সাল্লাঃ) উহার তত্ত্ব-কথাও বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সাল্লাঃ) বলেন, সেহরী খাওয়ার মাধ্যমে দিনের রোযা (-এর পরিশ্রম) আর রাত্রের ইবাদতে (-এর জন্যে জাগ্রত হওয়া)-এর কারণে দুপুরে ঘুমিয়ে নেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করো। (সুনানে ইবনে মাজাহ্, কিতাবুস্ সিয়াম বাব মা জাআ ফিস্ সাহূর)।

*অন্য একবার তিনি (সাল্লাঃ) বল্লেন,
"শেষ রাত্রের এই কল্যাণপ্রদ খাদ্য রাতের শেষ অংশে খাও" (আল্ জামেউস সগীর, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং ৩২৯২)।

* তিনি (সাল্লাঃ) আরও বলেন.
"সেহরী খাও এক চুমুক পানিই হোক না কেন"
(আল্ জামেউস সগীর, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং ৩২৯৩)।

আঁ হযরত (সাল্লাঃ)-এর সেহরী

হযরত উরবায বিন সারইয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন, "রমযানের কল্যাণমণ্ডিত মাসে আমি আঁ হযরত (সাল্লাঃ)-কে (মসজিদে উপস্থিত) সাহাবাগণকে সেহরীর জন্যে ডাকতে শুনেছে এবং তিনি বলতেন, ভোররাত্রের এই কল্যাণপ্রদ খাবার খেতে এস (সুনানে নেসাঈ, কিতাবুস্ সিয়াম বাব ফাযলুস্ সাহূর)।

* রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাঃ)-এর খাদেম হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একবার সেহরীর সময়ে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাঃ) বল্লেন "হে আনাস! আমি রোযা রাখবো, আমাকে খাবার জন্যে কিছু এনে দাও তো?" হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি খেজুর এবং একটি পাত্রে পানি নিয়ে আসলাম। আর ঐ সময়ে হযরত বেলাল (রাঃ)-এর প্রথম আযান হয়ে গিয়েছিলো (ঐ সময়ে তাহাজ্জুদের সময়ে একবার আযান দেয়া হতো – অনুবাদক)। হুযূর (সাল্লাঃ) বল্লেন, "আনাস দেখোতো বাবা, (মসজিদে) এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে আমার সাথে সেহরীতে অংশগ্রহণ করবে।" হযরত আনাস (রাঃ) হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ)-কে ডাকলেন। তখন তিনি বল্লেন, "আমি তো ছাতু, (যব, গম, প্রভৃতির গুড়ো পানিতে মিশিয়ে আহার করা হতো- অনুবাদক) পান করে রোযা রেখেছি।" হুযূর (সাল্লাঃ) বল্লেন, "আমরাও তো রোযাই রাখবো" সুতরাং যায়েদ বিন সাবেত হুযূর (সাল্লাঃ)-এর সাথে সেহরী খেলেন।" (সুনানে নেসাঈ, কিতাবুস্ সিয়াম বাব ফিস সাহূর বিস্ সাওইক ওয়া তাযার)।

এ থেকে ধারণা করা যায় যে, হুযূর (সাল্লাঃ) সেহরীতে কোন প্রকার আনুষ্ঠানিকতা করতেন না। যা সহজলভ্য ছিলো তদ্বারা রোযা রেখে নিতেন। বরং আঁ হযরত (সাল্লাঃ) বলেছেন, " খেজুর মু'মিনের জন্যে কতইনা উত্তম সেহরী!"

আঁ হযরত (সাল্লাঃ) রমযানে মুসলমানদের আরামের জন্যে এ ব্যবস্থা করেছিলেন যে, ভোরের দিকে দু'টো আযান হতো প্রথম আযান দিতেন হযরত বেলাল (রাঃ) ফজরের সময় হওয়ার পূর্বে। এর উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, লোকদেরকে অবহিত করানো যে, এখন সেহরীর শেষ সময়। যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ পড়ছে বা শুয়ে আছে উভয়েই যেন সেহরী খেয়ে নেয়। দ্বিতীয় আযান দিতেন হযরত ইবনে মকতুম (রাঃ)। যখন সুব্হে কাযেব বা ফজরের সঠিক সময় হতো তখন তিনি এ আযান দিতেন। আর এর উদ্দেশ্য হতো সেহরীর সময় শেষ হয়ে যাওয়ার ঘোষণা। এ জন্যে হুযূর (সাল্লাঃ) বলতেন, "যখন বেলাল আযান দিতে থাকে তখন খেতে থাকো আর যখন ইবনে মকতুম আযান দেয় তখন সেহরী খাওয়া শেষ করো"
(বুখারী, কিতাবুস্ সাওম বাব ক্বওলুন্নাবী লা ইয়ামানা'আকুম মিন সাহূরিকুম আযানি বিলাল)।

কিন্তু এতে অবকাশও রেখে দেয়া হয়েছে যে, যখন পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে ফজরের সময় না হয়ে যায় তখন খেতে ও পান করতে পারো যদিও বা আযান হতে থাকে (সুনানে নেসাঈ, কিতাবুস্ সিয়াম বাব কায়ফাল ফাজর)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সাল্লাঃ) বলেছেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ আযান শুনে এবং খাওয়ার ও পান করার পাত্র তার হাতে থাকে সেক্ষেত্রে সে যেন পাত্র রেখে না দেয় এমন কি যে, প্রয়োজনমত খেয়ে নেয়"
(সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুস্সাওম বাব ফি রাজুলু ইয়াসমা'উন্ নিদা'আ ওয়াল আনায়ে আলাহ্ ইয়াদাহ্)।

সেহরী খাওয়া কি আবশ্যক?

সেহ্রী না খেয়ে রোযা রাখার মধ্যে বরকত নেই। কিন্তু যদি ঐ সময়ে মানুষের ঘুম ভাঙ্গে যখন ফজরের সময় শেষ হয়ে গেছে এবং সেহরী খাওয়ার সময় না থাকে তখন সেহরী না খেয়েই রোযা রাখা বৈধ। কিন্তু অভ্যাসগতভাবে এমন করা পসন্দনীয় নয়।

আল্লাহ্তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা প্রতিষ্ঠিত রাখা খুবই জরুরী। প্রত্যেক পুণ্য কাজ ঐ সময়ই পুণ্যের কাজ বলে গণ্য হতে পারে যখন কিনা উহা আল্লাহ্তাআলা কর্তৃক বর্ণিত আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী এবং আঁ হযরত (সাল্লাঃ)-এর আদর্শানুযায়ী সম্পন্ন হয়। সেহরী না খেয়ে রোযা রাখাকে আঁ হযরত (সাল্লাঃ) পসন্দ করেন নি বরং ইহা বলেছেন, " সেহরী খাও। কেননা, সেহরীতে কল্যাণ নিহিত"। (চলবে)

অনুবাদ – মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
(৬-১-৯৮ তারিখের আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর সৌজন্যে)

জুমুআর খুতবা

মুবাহালা অব্যাহত থাকার ঘোষণা ঃ রমাযানের বহুবিধ কর্তব্য পালনসহ দোয়ায় ব্যাপকতা দানের আহ্বান

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

[৯ জানুয়ারী ১৯৯৮ ইং লন্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাওয়াউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর সূরা বাকারাহ্র ১৮৭তম আয়াত তিলাওয়াত করেনঃ وَإِذَا سَأَلَكَ .....

অতঃপর বলেন : বিগত জুমুআর খোৎবায় আমি রমযানুল মোবারক প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতটিরই তফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে কয়েকটি হাদীসের আলোকে রমাযানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলাম। ইহা সেই আয়াত, বিশেষতঃ এর মাঝে "ইযা সায়ালাকা ইবাদী আন্নী ফা-ইন্নী ক্বারীব" (আমার বান্দারা তোমার কাছে যখন আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আমি তো নিকটেই) এ অংশটির সম্পর্ক আমাদের মুবাহালার বছরটির সাথেও রয়েছে। বস্তুতঃ এ আয়াতটি আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের স্বপক্ষে এক মহান স্তম্ভস্বরূপ সাব্যস্ত হবে এবং এর উপরেই নির্ভর করে আহ্মদীয়া জামাত সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা পাবে, ইন্শাআল্লাহ্। কেননা, এতে রয়েছে আল্লাহ্র নিকটবর্তী হবার প্রতিশ্রুতি। আর এতে রয়েছে তাঁর বান্দাদের কাছে তাঁর এই প্রত্যাশা যে, "ফাল্ইয়াস্তাজিবূ লী"-তারা যেন তাঁর ডাকেও ইতিবাচক সাড়া দেয়, তাদের সঙ্গে জড়িত তাঁর প্রত্যাশাগুলোও যেন তারা পূরণ করে। অন্য কথায়, এটি হচ্ছে এতে বর্ণিত দু'টি শর্ত সাপেক্ষ প্রতিশ্রুতি। তারা যদি এ আয়াতটিকে কার্যতঃ সর্বদা তাদের মূলনীতি হিসাবে সমুন্নত রাখে, তাহলে আল্লাহ্র সক্রিয় সাহায্য আমাদের কখনও এড়িয়ে যায়- তা হতেই পারে না। বরং ইহা সদা সর্বদা আমাদের সহায়ক হয়ে থাকবে, ইন্শাআল্লাহ তাআলা। আর এখন বিশেষতঃ এই রমাযানে এর প্রয়োজন রয়েছে।

আজ যে শুক্রবারটি উদিত হয়েছে, ইহা এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কেননা, বিশ্বব্যাপী যে-সব উলামা আহ্মদীয়তের বিরোধিতার পুরোভাগে ছিল, তাদেরকে আমি ১০ই জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং তারিখে অর্থাৎ বিগত বছরের শুরুতে মাহে রমযানেই মুবাহালার ঐ চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম। তেমনি আজও ১০ই রমযান (লন্ডনে রমযানের দিক দিয়ে-অনুবাদক) এবং সেই হিসেবে Friday the 10th ও, উভয়দিক দিয়ে মিলে যাচ্ছে। ইহা আল্লাহ্তাআলার মাহাত্ম্য যে, তিনি এমনি করে আয়োজন করেন, কোন কোন সুসংবাদকে এমনি ধারায় বিন্যস্ত করেন যে, তাতে আল্লাহ্তাআলার হাত রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং, ১০ই জানুয়ারী ১৯৯৭ ইং শুক্রবার আমি যে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম তার সময়সীমার প্রথম বছরটি আজ ১০ই রমযানে পূর্ণতা লাভ করেছে। এই (বিগত) বছরটিতে আমাদের কতটা সফলতা লাভের সৌভাগ্য ঘটেছে তা এক উন্মুক্ত গ্রন্থের ন্যায় জাজ্বল্যমান বাস্তবতা, যা শত্রুরা পাঠ করতে পারে। বস্তুতঃ তারা তা পাঠ করছে এবং তাতে অস্থির ও উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। মারাত্মক চক্রান্তমূলক পাল্টা আক্রমণের কার্যক্রম নিয়ে তারা উঠে পড়ে লেগে গেছে। সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণে আমি আপাতত যাব না। কিন্তু ইশারা-ইঙ্গিতে তা আপনাদের জানাবো।

এর আগে সর্বপ্রথম আমি আমার উক্ত চ্যালেঞ্জের ভাষ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, যাতে স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায় যে, এসব উলামা ঐ মুবাহালাকে এখন যে বিকৃত অর্থে পেশ করে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে সামনা-সামনি হয়ে যে মুবাহালা অনুষ্ঠানের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায় ঐ ধরনের মুবাহালার সঙ্গে আমার ঐ মুবাহালার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। উহা ছিল (উভয় পক্ষের) এক তরফা দোয়া। উহাতে তাদেরকেও শামিল হবার জন্য আহবান করা হয়েছিল। তারপর তাদের দোয়া তাদের বিপক্ষে প্রতিফলিত হয়, কিনা এবং আমাদের দোয়া আমাদের বিপক্ষে যায় কিনা তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। অন্য কথায়, উল্লেখিত সময়সমীমার মধ্যে তাদের সঙ্গে আল্লাহ্তাআলা কী আচরণ করেন, আর আমাদের সঙ্গে তাঁর কী আচরণ প্রকাশ পায় তা অবলোকন করার প্রকাশ্য আহ্বান ছিল আমার সেই মুবাহালার ঘোষণাটিতে। নির্ধারিত মেয়াদের একটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এরই মধ্যে প্রার্থিত বিষয় সুপ্রকাশিত হয়েছে। বিগত এ বছরটিতে সংঘটিত ঘটনাবলীতে কারও পক্ষে কোনও হস্তক্ষেপ ও পরিবর্তন করার আর অবকাশ নেই। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ আমি-সময় ও সুযোগ সাপেক্ষে আগামী আন্তর্জাতিক বার্ষিক জলসায় উপস্থাপন করবো। এখন চ্যালেঞ্জের উদ্ধৃতি শুনে নিন, যাতে আপনাদের স্মৃতিপটে তা পুনরায় উদ্ভাসিত হয় ঃ **"তোমরা ব্যাপারগুলোকে চরমসীমায় পৌঁছে দিয়েছো। আর এদিক থেকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ছাড় বা অবকাশও দিচ্ছেন এবং যথেষ্ট দিয়েছেন। কিন্তু তোমাদের ধৃত হবার দিন আসবে, অবশ্য-অবশ্যই আসবে। এই সেই তকদীর বা নিয়তি যা তোমরা কখনো এড়াতে পারবে না।"** যখন আমি পাকিস্তানের এবং বিশ্বব্যাপী পত্র-পত্রিকা থেকে পরিসংখ্যান আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, তাতে তারা নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে, উল্লেখিত (তাদের ধৃত হবার) দিন এসে গেছে, নাকি এখনও আসেনি। এ সবই প্রকাশ্য বাস্তবতা। **"ধৃত হবার দিন আসবে, অবশ্য অবশ্যই আসবে। এই সেই তক্দীর বা নিয়তি যা তোমরা কখনও এড়াতে পারবে না। আজ এই জুমুআতে আমি ঘোষণা করছি যে, তোমাদের উপর লাঞ্ছনা ও জিল্লতীর কষাঘাত অবধারিতভাবে পতিত হতে যাচ্ছে।"** তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি থেকে আমি ইন্শাআল্লাহ্ সালানা জলসাকালে আপনাদের দেখাবো যে, আহ্মদীয়া জামাত যে মুবাহালা ঘোষণা

করেছিল উহার স্বপক্ষে বিগত বছরটি জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এই সাক্ষ্যগুলোকে কেউ পরিবর্তন করতে সক্ষম নয়। বস্তুতঃ এরা নিজেরা একে অন্যের সম্পর্কে ঘোষণা করছে যে, তাদের উপর লাঞ্ছনা ও জিল্লতীর কষাঘাত পতিত হয়েছে। আর এই কষাঘাতই ইনশাআল্লাহ্ আগামী বছরব্যাপীও অব্যাহত থাকবে। **"এই তকদীর পাল্টিয়ে দেখাও। যদি পাল্টাতে পার তবেই কিনা আমি তোমাদের সঙ্গে কোনও বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিনা তা বিবেচনা করবো।"**

প্রথমে মুবাহালার এই বছরটির ধকলতো সামলাও। আমি যে ঘোষণা করছি যে, তোমাদের উপর খোদাতাআলার কষাঘাত অবধারিতভাবে পতিত হবে, তা পরিবর্তন করে তো দেখাও– যখন পরিবর্তন করে দেখাবে, তখন এসে বলো "আসুন, এখন বহসও করে নিন।" বহস-বিতর্কের পথ এখন রুদ্ধ, কেবল এই ইলাহী ফয়সালাই আবশ্যকীয়ভাবে অধিকতর কার্যকর হতে যাচ্ছে।

আমাদের জামাতকে আমি এই উপদেশ দিয়েছিলাম, **"আজ জুমুআর এই খোৎবায় আমি এক চূড়ান্ত ফয়সালা নির্ধারক রমাযানের (অর্থাৎ বিগত '৯৭ সালের রমযান সম্পর্কে বলেছিলাম) প্রত্যাশা রেখে আহ্মদীয়া জামাতকে এই তাকিদ করছি (জোরদার আহ্বান জানাচ্ছি) যে, আপনারা এই রমযানকে বিশেষভাবে এই দোয়ার জন্য ওয়াক্ফ করে দিন যে, "হে খোদা! এখন তুমি ওদের এবং আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দাও। কেননা, তুমিই হলে আহ্কামুল হাকেমীন– তোমার চেয়ে উত্তম অন্য কেউ ফয়সালাকরী নেই।"**

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের জামাত আমার ঐ নসিহতকে আঁকড়ে ধরে এবং তদনুযায়ী দোয়া করে। যদি এই সফল দোয়া তারা না করতো, তাহলে ঐ ফলাফল প্রকাশিত হতো না, যা আপনাদের চোখের সামনে বরং সারা বিশ্বের সম্মুখে বিদ্যমান রয়েছে। আর এই দোয়া যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কেবল তাদেরই জন্য নির্দিষ্ট, জনসাধারণের ধ্বংস হবার জন্য কোন দোয়া নেই। বরং ওরূপ দোয়া থেকে সর্বদা আমি দূরে থাকি যে, নাউযুবিল্লাহ পাকিস্তানের জনগণের বিপক্ষে কখনও বদদোয়া করি, তা সবসময় আমি পরিহার করে থাকি। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি ইলহাম (ঐশীবাণী) থেকে স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায় যে, যারা এদের প্রথম সারির নেতা– ঐ ধরনের দুষ্ট-দুষ্কৃতিপরায়ণদের (হে আল্লাহ!) নিপাত কর। এই দোয়াটিকে মৌলবীরা জেনে-শুনে সর্বদা বিকৃত ক'রে জনসাধারণকে এই বলে উস্কানি দেয় যে, জনসাধারণের বিরুদ্ধে কিনা বদদোয়া করা হয়েছে। ইহা সর্বৈব মিথ্যা। এর প্রত্যাশা কখনও আমি আপনাদের কাছেও করি না এবং নিজেও আমি কখনও ওরূপ করিনি। আমার অবিরত চেষ্টা এই যে, পাকিস্তানের জনগণ যেন তাদের মোল্লাদের জিল্লতীর কষাঘাত ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। তবে ঐ কষাঘাত পরিণামে তাদের উপরও পতিত হবে। কেননা, যে ধরনের নেতা ও পথ প্রদর্শক হয়ে থাকে, ওরূপ উলামার দুষ্কর্মের কুফল থেকে কার্যতঃ তাদের (অনুগামী) জাতিরাও বাঁচতে পারে না। এ প্রসঙ্গেই আমি বর্ণনা করেছিলাম : **"হে খোদা! এখন ঐ সমস্ত ফেরাউনদেরকে তুমি নিপাত ও নিশ্চিহ্ন কর, যারা ক্রমাগত অহংকার ও মিথ্যাচারে আগের চেয়েও বেড়ে গিয়ে অধিকমাত্রায় আস্ফালন করছে এবং যুলুম-অত্যাচার ও নির্লজ্জতা থেকে নিবৃত্ত হচ্ছে না। সুতরাং আমাদের জন্য এ বছরই অথবা এর পরবর্তী বছর কিংবা এসব মিলিয়ে প্রত্যেকটিকেই (অর্থাৎ আগামী বছরটিকেও) ফয়সালা নিরূপকস্বরূপ করে দাও, যাতে এই শতাব্দী তোমার অপার অনুগ্রহে দুশমনদের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ও অকৃতকার্যতার শতাব্দী হয়ে যায় এবং নতুন শতাব্দী আহ্মদীয়াতের নব মর্যাদার সূর্য নিয়ে উদিত হয়। আমি চাই এইসব দোয়া যেন আপনারা বিশেষভাবে এই রমাযানে করেন এবং রমাযানের পরেও সর্বদা এই সকল দোয়াতে যত্নবান থাকেন।"**

এই উদ্ধৃতিটিতে বিগত এক বছরে এবং পরবর্তী এই বছরটিতেও অহংকারে লিপ্ত যেসব ফেরাউন-স্বভাবাপন্ন লোকদের নিপাত ও নিশ্চিহ্ন হবার জন্য বিশেষ দোয়ার উল্লেখ রয়েছে সে-সম্পর্কে পাকিস্তানের আদ্যোপান্ত ইতিহাস সাক্ষ্য-প্রমাণ বহন করে এবং এখন সেখানকার পত্রপত্রিকাগুলোতে ঐ লোকদের ধ্বংসের পরিসংখ্যান বড় বড় শিরোনামে বেরুচ্ছে এই বলে যে, বিগত বছরটিতে (১৯৯৭ ইং) যে বিপুল সংখ্যায় মৌলবীরা নিহত হয়েছে ইতোপূর্বে এর কোন নজির নেই। অস্বাভাবিক অপমৃত্যুর শিকার হয়েছে তারা। তাদের মধ্যে কোন কোন মোল্লার লাশ মরা কুকুরের ন্যায় বাজারগুলোতে টানা-হেঁচড়া করা হয়েছে। এবং তারা নিজেরা একে অন্যের হাতে মারা পড়েছে। বিগত বছরটিতে ভয়াবহ শাস্তিস্বরূপ তাদের এই দৈন্যদশা প্রমাণ করছে যে, ঐ দোয়াসমূহ আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হয়েছে। অথচ তারা কিনা বলে, 'তোমাদের দোয়াতে নয় বরং এসব কিছু এমনিতেই (দৈবক্রমে) ঘটে গেছে।' এমনিতে কী ক'রে ঘটে গেলো? ইতোপূর্বে কখনও ওরূপ ঘটলো না! নাউযুবিল্লাহ বসে বসে হঠাৎ কী ক'রে আল্লাহ্ মনস্থ করলেন যারা আহ্মদীয়তের ঘোর শত্রু তাদেরকে যেন তাদেরই একে অন্যের হত দিয়ে বধ করা হয়?! এবং একশ' ভাগ প্রমাণিত যে, তাতে আহ্মদীয়া জামাতের কোনও হাত নেই। তারা অবশ্য বলে থাকে যে, আহ্মদীয়া জামাতের হাত আছে। কিন্তু প্রশ্ন করলে বলে, কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। অতএব, এটাও তারা মিথ্যা বলছে যে, তাদের এসব অপমৃত্যুতে আহ্মদীয়া জামাতের হাত আছে। এরা নিশ্চিত জানে যে, এদেরই একে অন্যের হাত রয়েছে। এরা অবশিষ্ট গোটা আগামী বছরটির সম্বন্ধে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে বসে আছে, অর্থাৎ যে বছরটি (–'৯৮) এখন আরম্ভ হয়েছে– এ বছরটি সম্পর্কে আমি কেবল এটুকু বলে দিতে চাই যে, বিগত বছরটি তো অতিক্রান্ত হয়েছে, তাতে তারা তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করে দেখে নিয়েছে। কিন্তু গত বছর যা ঘটে গেছে তা আর পরিবর্তন করার তাদের কোন সাধ্য নেই, যত ইচ্ছা জোর খাটাক না কেন। তবে এদের যেসব পরিকল্পনা ছিল তা অব্যাহত আছে এবং অত্যন্ত জোরে-শোরে, তীব্র ধারায় অব্যাহত আছে। ঐ সময় মুবাহালা প্রসঙ্গে আল্লাহ্তাআলা আমার মুখ দিয়ে '৯৮-এর বছরটির কথাও বলালেন। সেমতে বিগত ('৯৭) সালে তো তারা নিঃসন্দেহে হেরে গেছে, আগামী বছরও নির্ঘাৎ পরাজিত হবে। তাদের চেষ্টা-প্রয়াস '৯৮ সালে পূর্ণমাত্রায় তুঙ্গে উঠবে এবং

সেদিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে কোথায় কীরূপে তাদের কর্মকাণ্ড চলছে। সুতরাং গ্যাম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি জামের সহিত যে সব আচরণ প্রদর্শন করা হয়েছিল, সৌদীয় সরকার কর্তৃক তাকে যে লালগালিচা সম্বর্ধনা ও হিরো হিসেবে গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়েছিল, অনুরূপ পন্থায় এখন সেনেগালের রাষ্ট্রপতিকে যিনি নিজে একজন ফরাসী ভাষী এবং খোদাতাআলার ফযলে ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ বিদ্বেষমুক্ত, তাঁর সাথে হুবহু একই আচরণ প্রদর্শন করা হয়েছে। এই কর্মকাণ্ডের পুরোভাগে ছিলেন (গ্যাম্বিয়ার) রাষ্ট্রপতি জামে। সেখানে যেমন তাঁকে গোল্ড মেডেল দেয়া হয়, ইসলামের একজন বিশেষ সেবক হিসাবে তুলে ধরা হয়, সৌদী আরব তাঁকে যে কত সম্মান করে তা প্রকাশ্যভাবে দেখানো হয়, তদ্রূপই তিনি এখন সেনেগালের রাষ্ট্রপতির সাথে সৌদী আরবের দ্বারা করাচ্ছেন। এই কর্মকাণ্ডের সব কলকাঠি রয়েছে পাকিস্তানে– পরিচালনার রাশ ধরা আছে পাকিস্তানের হাতে। আর তারা মনে করছে আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সমস্ত কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচরে রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে দু'টি। একটি হচ্ছে তাদেরই মধ্যে থেকে সদচেতা ব্যক্তিরা স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের সরকারকে না জানিয়ে অগোচরে জামাতকে সব খবর অবহিত করেন, অথচ তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সংশ্রব নেই। সেজন্য আমাদের দিক থেকে এতে কোন গোয়েন্দাগিরির প্রভাব আছে ওরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যে। গুপ্তচরবৃত্তির আমাদের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের তত্ত্বাবধায়ক। তিনিই সকল অবস্থা ও পরিস্থিতির উপর দৃষ্টি রাখেন এবং আমাদের অবহিত করেন। দ্বিতীয়তঃ তাদের মোল্লারা হচ্ছে মুখ-পাতলা, অসংযত। মুখ বন্ধ রাখতে অপারগ তারা। গালভরে কথা বলতেই হয় তাদেরকে। এই দু'টি উপায়ে আমরা খবরাখবর পেয়ে থাকি। একটি তো হচ্ছে তাদের নির্ভরযোগ্য সরকারী কর্মচারীরা। তাদের মধ্যে একজনও আহ্‌মদী নয়। তাদের সাথে বসে তারা যেসব কথা বলে তা শুনে তাদের অন্তর সাড়া দেয় যে, ঐসব কথাই সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং প্রলাপ বৈ অন্য কিছু নয়। আর তারা যেভাবেই হোক নিজেদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমাদের কাছে খবরাখবর পৌঁছে দেয়। এখন আপনারাই বলুন, এক্ষেত্রে আহ্‌মদীদের ষড়যন্ত্রের কথা কী ক'রে আসে?! যদি কোন ষড়যন্ত্র থেকে থাকে, তাহলে হে আহ্‌মদীয়ত বিরোধী চক্রের হোতারা! তোমরা নিজেরা এর ব্যবস্থাপক হিসেবে তাদের নিযুক্ত করেছ এবং তোমরা দিশেহারা হয়ে চারদিক তাকিয়ে দেখতে থাক – কোথা থেকে কে বলে দিচ্ছে! তারা তোমাদেরই নিযুক্ত করা লোক। আমরা জানাবো না যে, কে তারা। তোমরা আরও অস্থির ও উদ্বিগ্ন হতে থাকবে। তোমরা তো কাঁচের গৃহে বসবাস কর, সবাই তোমাদের সবকিছু দেখতে পাচ্ছে। আর মোল্লাদের সম্পর্কে তো বলতে পার না যে, তারা আমাদের এজেন্ট। তবে কাজ তারা ওটাই করে যা এজেন্টরা করে থাকে। কিন্তু তারা হচ্ছে নিছক বিরুদ্ধবাদী মোল্লা– মুখপাতলা, তারা লোভ সংবরণ করতেই পারে না। কোন গোপন তথ্য তাদরে কারও হাতে এসে গেলে তৎক্ষণাৎ দুনিয়াকে জানাবার জন্য যে, সে ঐসব কাজ করিয়েছে এবং আহ্‌মদীয়তের বিরোধিতায় সে-ই ঐসব কিছু পরিচালনা করছে তা মানুষকে জানাবার লোভ সংকরণ করতে না পেরে অনিবার্যতঃ সে বলবেই বলবে। তার মুখে যদি লাগামও পরানো হয়, তবু ইশারা-ইঙ্গিতে হলেও মানুষকে জানাবে, সে-ই ঐ কাজ করাচ্ছে। সেজন্য উক্ত দু'টি ব্যবস্থা বা উপায় আল্লাহ্‌র ফযলে আমাদের জন্য খোলা রয়েছে, যারা তাঁর তক্‌দীরের অধীনে সর্বদা আমাদের সাহায্য করে থাকে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে। সুতরাং (সেনেগালের রাজধানী) ডাকারে পাকিস্তান দূতাবাসের যোগসাজশে যা কিছু ঘটেছে, তার লাগাম পাকিস্তানে ধরা আছে এবং কীভাবে সেখান থেকে কলকাঠি নাড়া হচ্ছে– নির্দেশ-উপদেশ দেয়া হচ্ছে, সেমতে কীভাবে (সম্প্রতি গ্যাম্বিয়ার) রাষ্ট্রপতি জামে সাহেবকে বলা হয় তিনি এবং তাঁর প্রতিনিধি শীঘ্র যেন ডাকারে যান এবং সেখানে আহ্‌মদীয়তের বিরোধতার উদ্দেশ্যে কেন্দ্র স্থাপন করেন। এ হিসেবেই এক্ষেত্রে তিনি কাজ করেন এবং তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ডাকারে এখন রাবেতা-আলমে-ইসলামীর আহ্‌মদীয়তবিরোধী একটি কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে। তাতে কীইবা ফল হবে?! ইতোপূর্বে রাবেতার ঐ যাবতীয় কার্যক্রম ও কর্মতৎপরতাকে আল্লাহ্‌তাআলা লাঞ্ছনায় ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছেন। আজও সে একই ঐশী তক্‌দীর কার্যকর হবে অর্থাৎ '৯৮ ইং সালেও, ইনশাল্লাহ্‌তাআলা। আগেই যেমন বিগত মুবাহালার দোয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা কর্তৃক আমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল যে, **মুবাহালার (সম্পূর্ণ) ফলাফলের জন্যে শুধু '৯৭ই যথেষ্ট নয়, বরং '৯৮ সালটির জন্যও দোয়া করো।** কাজেই আমি আশা করি যে, **আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত খোদাতাআলার অনুগ্রহক্রমে '৯৮ সালের জন্যও পূর্ববৎ সে ধারাতেই দোয়া করতে থাকবে বরং আগের চেয়েও অধিক জোরে-শোরে করবে। এই সকল দোয়াই আমাদের ভরসা ও অবলম্বন স্বরূপ। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো ভরসা ও অবলম্বন নেই।**

"ইন্নাহুম ইয়াকিদূনা কায়দাঁও ০ ওয়া আকীদু কায়দা ০ ফামাহ্‌হেলিল্ কাফেরীনা আম্‌হিলহুম রুওয়ায়দা ০" (অর্থ–"নিশ্চয় তারা ষড়যন্ত্র করবে–গভীর ষড়যন্ত্র। এবং আমিও কৌশল করবো– উত্তম কৌশল। সুতরাং তুমি কাফেরদের অবকাশ দাও, অবকাশ দাও তাদেরকে কিছু সময়ের জন্য।") আল্লাহ্ বলেছেন, "এরা অনেক গভীর ষড়যন্ত্র করছে। তোমরা মনে করো না যে, তারা ষড়যন্ত্র ছাড়াই বসে আছে। পরন্তু, অনেক বড় চক্রান্তমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নে তারা তৎপর রয়েছে। কিন্তু আমিও সচেতন–সব খবরই আমি রাখি। আপাততঃ আমিও পাল্টা 'প্লট'– কৌশলগত খসড়া ও নকশা তৈরী করছি।" আল্লাহ্‌র এই পবিত্র বাণীটিতে আমার জন্য যে দিক-নির্দেশক নীতিটি নিহিত ছিল (বা রয়েছে) তা হচ্ছে এই যে, আমি যেন পাল্টা কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য আমার সবটুকু শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা প্রয়োগ করি। কেননা, বিশ্বে এখন আমি খোদাতাআলার আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামের সেবা-কার্যে আদিষ্ট। আর সেদিক থেকে এই জামাতের বিরুদ্ধে যতসব কু-তৎপরতা পরিচালিত হচ্ছে, সেগুলোর পাল্টা উত্তর দেওয়া আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা, "আকীদু কায়দা"–'আমিও কৌশল করা'র বিষয়টি খোদাতাআলার দিকে আরোপিত হয়। কিন্তু তাঁর ঐ সকল কৌশল তাঁরই অনুগ্রহক্রমে তাঁর বান্দাদের মাধ্যমে প্রবর্তন ও কার্যকর করা হয়। "আকীদু কায়দা"-এর অর্থ এ নয় যে, 'আমি

(আল্লাহ্) আকাশে (ঊর্ধ্বলোকে) কৌশল ও তদ্বির করছি, যা আকাশেই অবস্থান করবে।' বাস্তুতঃ ঐসব তদ্বির আকাশ থেকে নীচে অববতীর্ণ হয় এবং তিনি যাকে পসন্দ করেন তাকে জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দান করেন, তাকে সামর্থ্য ও যোগ্যতা দান করেন যাতে সে ঐসব চক্রান্তগুলোর প্রতিকার করে। এই ব্যাপারে আপনাদের কোন দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। সে চিন্তা-ভাবনার দায়িত্ব আমার উপর ফরয কর্তব্য স্বরূপ ন্যস্ত। আপনাদের পক্ষে আমার প্রতিনিধিত্বের হক্ বা অধিকার তবেই সুসম্পন্ন হবে যে, আমি যেন আমার সম্ভাব্য সকল সামর্থ্য ও ক্ষমতা ব্যবহারে ঐ যাবতীয় চক্রান্ত ও অপতৎপরতার প্রতিবিধান করি, কিন্তু এই দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে যে, এই তদ্বির ও কৌশল কোন পার্থিব কৌশল নয়, বরং তা হচ্ছে 'আকীদু কায়দা'-এরই প্রতিফলন ও জবাবস্বরূপ। ঊর্ধ্বলোকে আল্লাহ্ তদ্বির করছেন আর নীচে তা অবতীর্ণ করছেন এবং যেসব বান্দাদের তিনি এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চান, তাদেরকে তিনি আবশ্যকীয় তদ্বিরের জ্ঞান দান করেন, তাদের অন্তরে সেগুলো প্রতিভাত করেন। সেজন্য অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সচেতনতার সঙ্গে সকল সূক্ষ্ম স্তরের সজাগ দৃষ্টি রেখে আমরা সম্ভাব্য সব রকম তদ্বির অবলম্বন করছি। **কিন্তু এইসব চেষ্টা-তদ্বিরের ফয়সালা নির্ধারণ করবে আপনাদের যথাসাধ্য প্রাণবন্ত দোয়া**– এই রমযানের দোয়া, যা অবশিষ্ট রয়েছে এবং এরপরও সারা বছরব্যাপী অবিরাম দোয়া, যা অব্যাহত থাকবে। **কাজেই '৯৭ সালের মতোই '৯৮ সালটিও আমাদেরই ; অবশ্য-অবশ্য আমাদেরই হবে। দুনিয়ার কোনো শক্তি এ বছরটিকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। এই দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে আপনারা এগিয়ে চলুন এবং এই দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে আপনারা দোয়ায় রত থাকুন। এর ফলে দেখবেন, যা আমি বলছি, তাই ঘটবে-ইনশাআল্লাহ্।**

ডাকার ও রাবেতা-আলমী সম্পর্কিত যেসব প্রামাণ্য কাগজপত্র আমার হাতে দেয়া হয়েছে, এসব আর পাঠ করে শুনাবার প্রয়োজন নেই। তা অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এসব কিছুর সারবস্তু অমি বলে দিয়েছি।

এখন আমি, খোৎবার শুরুতে তিলাওয়াতকৃত আয়াতটির আলোকে যেসকল হাদীসে-নববী ধারাবাহিকভাবে আপনাদের সামনে পেশ করে আসছি সেগুলো বর্ণনা করতে চাই।

"বুখারী, কিতাবুস-সাওম, বাবু মান্‌লাম্ ইয়াদো' কওলায্ যূর" থেকে হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস : আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি মিথ্যে কথা এবং মিথ্যে কাজ পরিহার করে না ওরূপ ব্যক্তির রোযা রেখে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকার আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই।" অর্থাৎ তার রোযা রাখা বৃথা। ইহা সেই হাদীস, যা যথাসম্ভব প্রত্যেক মাহে-রমাযানে আমি বর্ণনা করে থাকি। কেননা, আমার দৃষ্টিতে ইহা কেন্দ্রীয় মর্যাদা বহন করে, রমাযানকে শোভিত ও সার্থক করে তোলার দিক দিয়েও এবং আপনাদের ইহজীবন ও পরকালের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনের দিক দিয়েও। মিথ্যা কথা বলা, যাকে 'কওলুয্-যূর' বলা হয়, অত্যন্ত ঘৃণ্য বিষয়, যা মানুষকে এ দুনিয়াতেই অবধারিতভাবে ব্যর্থতার তিক্ততা ভোগে বাধ্য করে থাকে এবং পরকালেও সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। অতএব **সত্যবাদিতা অবলম্বন করুন, রপ্ত করুন এবং মিথ্যাচারিতাকে সর্বতোভাবে বর্জন করুন** অর্থাৎ নিজেদের দৈনন্দিন সব বিষয়ে নিজেদের স্ত্রী, সন্তান, মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ি, ভাই-বোন সকলের সাথে কথাবার্তায় এবং ব্যবহারে। আর তেমনি অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলোতে সত্যকে চেপে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও না কোন আকারে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটে থাকে। সাধারণত ঘরে-ঘরেই মিথ্যা মাখানো কথার প্রচলন রয়েছে। মিথ্যার মিশ্রণমুক্ত ঘর খুবই বিরল। একেবারে যে নেই তাও নয়। কোন কোন গৃহ সম্পর্কে আমি একশ' ভাগ দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি যে, সেখানে মিথ্যার লেশমাত্রও মিশ্রণ নেই। পক্ষান্তরে ওসব গৃহই প্রচুর, যেখানে তারা যদিও বিভিন্ন রকম অনেক সৎকাজ করে থাকেন, কিন্তু যখন কারও প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন ছোট-বড়, তাদের মধ্যে কারও পক্ষে আর মিথ্যা থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ ব্যাপারটা এরূপ, যা তাদের তাকওয়াকে উলঙ্গ করে দেয়। তাতে তাদের তাকওয়ার দুর্বলতা ও কদর্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ যখনই নিজের প্রয়োজনে কেউ মিথ্যার আশ্রয় নেয়, ওটাই আসল মিথ্যা, যা শির্‌কের দিকে আকর্ষণ করে থাকে। অপ্রয়োজনে যেসব মিথ্যা দৈনন্দিন সাধারণতঃ বলা হয়, যেমন কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তোমাদের বৃথা ও বেহুদা কসমগুলোকে আল্লাহ্ ভ্রূক্ষেপ করেন না।" অনেক সময় অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বেরিয়েই পড়ে, কথাবার্তায় অলংকারসাধান বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে, কিন্তু ওসব ক্ষেত্রে নিজেকে অথবা নিজের সাথীদের উদ্ধার বা স্বার্থ রক্ষার কোন উদ্দেশ্য থাকে না। যথাসম্ভব এ ধরনের মিথ্যা থেকেও অবশ্যই নিজেদের রক্ষা করা উচিত। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ সামাজিক জীবনে অজ্ঞাতসারে ওধরনের মিথ্যায় জড়িয়েও পড়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ওরূপ মিথ্যা শিরকে পর্যবসিত হয় না। ওসব মিথ্যা 'গোনাহ্ কবীরা' (বড় পাপ) বলে গণ্য হয় না, বরং সেগুলো হয়ে থাকে 'গোনাহ্ সগীরা' ক্ষুদ্র পর্যায়ের অর্থাৎ মিথ্যা তো মূলতঃ কবীরা গোনাহ্ই বটে, কিন্তু যেহেতু ইচ্ছাকৃতভাবে বলা হচ্ছে না, কাউকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে না বা নিজের মিথ্যা স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বলা হচ্ছে না– সেদিক থেকে ওরূপ মিথ্যা কার্যতঃ সগীরার পর্যায়েই থাকে। এবং বৃথা কসমের ক্ষেত্রে বর্ণিত তাঁর রীতি অনুযায়ী আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু এ ধরনের মিথ্যা যদি সমাজে প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করে, তাহলে আমার অভিজ্ঞতা এই যে, ওরূপ সমাজ তখন বড়ো মিথ্যাচারিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের পরীক্ষা তখন সামনে উপস্থিত হয়, যখন তাদের সামনে তাদের স্বার্থ বা প্রয়োজন এসে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় তারা যদি নিজেদের স্বার্থে বা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে তাদের পূর্ববর্তী সমস্ত ক্ষুদ্র মিথ্যাও কবীরা গোনাহ্-এ পর্যবসিত হবে। এটা বস্তুতঃ টেস্ট্ কেইস। ওরূপ ব্যক্তি যদি ঐ সময় মিথ্যার ধার না ধারে যখন তার স্বার্থ তাকে বলে, 'তুমি অবশ্য অবশ্যই মিথ্যা বল' তবুও যদি সে সত্যকথাই বলে, তাহলে তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্ত মিথ্যা বৃথা কসমের পর্যায়ভুক্ত হবে। সেগুলোর জন্যে ওরূপ ব্যক্তি জবাবদিহীতার সম্মুখীন হবে না। কিন্তু যখনই পরীক্ষার মুখে সে পদস্খলিত হয়, অর্থাৎ নিজের বা আত্মীয়-স্বজনের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মিথ্যা বলে ফেলে, তৎক্ষণাৎ তার সগীরাগুলো কবীরা গোনাহ্ হিসেবে গণ্য হবে। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব, যা আপনারা

ভালোভাবে বুঝে নিন। সগীরা বা বৃথার পর্যায়ে মিথ্যা বা অন্য কোন গোনাহ্ ততক্ষণ পর্যন্তই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা শিরকে পর্যবসিত হয়। যখন কোন ব্যক্তি স্পষ্টতঃ শির্‌কে জড়িয়ে পড়ে তখন তার মিথ্যা ক্ষুদ্র ও বৃথা বলে গণ্য হবে না। প্রাত্যহিক সাধারণ ব্যাপারস্বরূপ তার ঐ মিথ্যা ওরূপ ব্যক্তিকে শির্‌কে লিপ্ত বলে সাব্যস্ত করবে। আমি আপনাদের কাছে আশা করি, এ পবিত্র হাদীসটির যত গভীরে আপনারা চিন্তা-ভাবনা করবেন ততই তত্ত্বজ্ঞানীর ন্যায় জ্ঞানতত্ব লাভ করতে থাকবেন। **মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ (বা সংগ্রাম) একটি মহান জিহাদ। সুতরাং আহ্‌মদীয়া জামাতের জিহাদের দাবী ততক্ষণ পর্যন্ত সত্য সাব্যস্ত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সারা বিশ্বব্যাপী মিথ্যার বিরুদ্ধে জিহাদের পতাকা উত্তোলন করে। অতএব, আশা করি, আপনারাও কেবল ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত হয়ে থাকাটাকেই রোযা বলে মনে করবেন না, বরং আল্লাহ্‌র ফযলে মিথ্যা থেকে দূরে থাকার সব পথই অবলম্বন করবেন, সর্বতোভাবে মিথ্যা পরিহারে যত্নবান হবেন।** সর্বদা নিরীক্ষণ করতে থাকবেন, কোথাও যদি মিথ্যা দেখতে পান, তাহলে মনে রাখবেন যে, উহাই আপনাদের শত্রু, যা আপনাদের হৃদয়-কন্দরে ঘাপটি মেরে বসে আছে, সুযোগ পেলেই উহা আপনার উপর আক্রমণ করে বসবে যদি তা থেকে বিরত না থাকেন। সুতরাং ইহা শিরকের একটি মূর্তিস্বরূপ যা হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকে। কখনও পৃষ্ঠদেশের কাছাকাছি, আবার কখনও অনেক নীচে। এই মূর্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে হবে। যদি ভেঙ্গে দেন তাহলে ইব্রাহীম (আঃ)-এর ন্যায় **মূর্তি ভঙ্গকারী** বলে অভিহিত হবেন। যদি এই মূর্তিকে না ভাঙ্গেন, তাহলে সমস্ত মূর্তি ওঠে দাঁড়াবে এবং আপনার অন্তর মূর্তির আড্ডায় পরিণত হবে। ওরূপ হৃদয় কখনও আল্লাহ্‌র অবস্থানের জন্য মসজিদ-কা'বাস্বরূপ সাব্যস্ত হয় না। আশা করি, এবিষয়বস্তুটি ভালোভাবে অনুধাবন করে নিজেদের জীবনে ইহার বাস্তবায়নে যত্নবান হবেন।

সহী মুসলিমের একটি হাদীস– এটি হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, "এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সাঃ)-কে প্রশ্ন করে, 'যদি আমি ফরয নামাযগুলো আদায় করি, রমাযানের রোযা রাখি এবং হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম বলে মান্য করি, এবং এর অধিক কিছুই পালন না করি, তাহলে আমি কি জান্নাতে প্রবিষ্ট হতে পারবো? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ।' সে বললো, 'খোদার কসম, এর অতিরিক্ত কিছুই করবো না।'

এখানে যে বিষয়বস্তুটি রয়েছে তাতে আপাতঃ দেখা যায় যে, ঐ ব্যক্তি তার করণীয় কাজগুলোকে সীমিত বলে নির্ধারণ করছে এই মর্মে যে, কখনও নফল কোন ইবাদত বা অতিরিক্ত কোন সৎকাজ সে পালন করবে না। তবুও সে জান্নাতে প্রবেশ করবে কিনা? এগুলো হচ্ছে ন্যূনতম শর্ত, যা মু'মিনের জন্য জান্নাত লাভের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়। এ থেকে এতটুকুও যদি স্খলিত হয় তাহলে এর একধাপ নীচেই রয়েছে জাহান্নাম, যেখানে সে পদস্খলন হওয়া মাত্র পতিত হবে। তবে এই মৌলিক শর্তাবলী যদি সে পুরা করে তাহলে সে অবশ্য জান্নাতী বলে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু এই মৌলিক কর্তব্যগুলোই পালন করাটা কোন মামুলী ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ নফল ইবাদত এগুলোর হিফাযত ও সংরক্ষণ করে থাকে। যদি ঐ ব্যক্তি নফল ব্যতিরেকে এগুলোর হিফাযত করতে পারতো, তাহলে ঐ শর্ত সাপেক্ষেই আঁ হযরত (সাঃ) তার প্রতিজ্ঞায় সম্মতি জানিয়ে ছিলেন এই বলে যে, পারলে কর, যদি তোমার প্রতিজ্ঞায় তুমি কায়েম থাক এবং উত্তীর্ণ হতে পার, তাহলে নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করবে। এখন লক্ষ্য করুন, ঐ ব্যক্তি বলেছে যে, যদি সে ফরয নামাযগুলো আদায় করে, – এই ফরয নামায আদায় একটি অনেক বড় দাবী – ঐ সব নামায, যেগুলো দণ্ডায়মান রয়েছে এবং সেগুলোকে খাড়া রাখতে হয়। কাজেই সে যদিও আপাতঃ পাকা- পোক্ত কথাই বলেছে, কিন্তু তা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে অনেক বড়ো একটি কর্তব্য পালনের দাবী। তারপর, সে বলেছে, 'রমাযানের রোযা রাখবো'। অর্থাৎ রোযা রাখতে বুঝায়, এর যথাযথ শর্তাবলী সহকারে তা পুরা করা। তারপর সে বলেছে, 'হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে মান্য করবো।' এবার লক্ষ্য করুন সে কতো বড় বড় পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হবার অঙ্গীকার করেছে? "হারামকে হারাম" – অথচ মানুষের জীবনে এরূপ বহু উপলক্ষ্য উপস্থিত হয়, যখন তার অর্থ-সম্পদে কার্যতঃ হারামের মিশ্রণ থাকে। আর সে কিনা অঙ্গীকার করছে, "হারামকে আমি হারাম বলে জ্ঞান করবো এবং নিজের ধন-সম্পদে হারামের মিশ্রণ হতে দেবো না।" অনেক সূক্ষ্ম ও উচ্চ মর্যাদার দাবী! অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বনের দাবী! নিজের উপার্জনের ক্ষেত্রে সব দিকে দৃষ্টি রাখার দাবী! কতজনই বা এই দাবীকে পুরা করে এবং তাতে উত্তীর্ণ হয়ে থাকে। তারপর সে-ব্যক্তি বলেছে, "এর অতিরিক্ত কোন কিছু পালন করবো না।" ওরূপ লোক কতজন আছেন যারা তার চেয়ে অতিরিক্ত আমল করে থাকেন? যারা রোযাদার রয়েছেন, আমাকে বলার দরকার নেই, নিজেদের বাড়ী গিয়ে চিন্তা করে দেখুন, তারা কি হারামকে হারাম হিসেবে মান্য করার প্রতি দৃষ্টি রাখেন? তথাপি আমরা জান্নাত লাভের আশাবাদী হয়ে বসে আছি, এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যদি আমাদের সহায়ক হয় তাহলে অবশ্য-অবশ্যই আমাদের জান্নাতে যাওয়ার কারণ হবে– দুর্বলতাগুলো সত্ত্বেও অর্থাৎ হারামকে হারাম এবং হালালকে হালাল বলে জ্ঞান ও মান্য করার ক্ষেত্রে যে সব দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই এ হাদীসটির দাবী ও চাহিদা অনেক বিরাট ও ব্যাপক। ইহা ধর্ম-কর্মকে সহজসাধ্য বলে সাব্যস্ত করছে না। এমন নয় যে, মৌলিক বিষয়গুলো সব পুরো করে দিলাম, আর বস্ ছুটি পেলাম। যখন পালন করতে যাবেন তখন বুঝতে পারবেন ছুটি পাওয়ার প্রশ্ন অবান্তর। বরং যাত্রার সূচনা হয়েছে মাত্র। তবে যেহেতু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঐ ব্যক্তিকে তার প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে 'হ্যাঁ' বলে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন, সেহেতু হয়তো বা সে সত্যি সত্যি তার দাবীতে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

তবে ঐ ব্যক্তির নাম-পরিচয় কেন উল্লেখ করা হলো না, এ বিষয়টি বোঝা গেলো না। এর মধ্যে নিশ্চয় কোন তাৎপর্য নিহিত ছিল। হযরত জাবের কর্তৃক হাদীসটি বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি আঁ হযরত (সাঃ)-এর কাছে প্রশ্ন করলো। তার নাম-পরিচয়ের কোথাও উল্লেখ রয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করা উচিত। অথবা এটাও একটা তৎকালীন পদ্ধতি ছিল। এ বিষয়টিতে আমার কৌতূহল এ জন্যও যে, কোন কোন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) মানুষের আকৃতিতে রূপান্তরিত হতেন এবং ধর্মের সব দিক মুসলমানদের শিখাবার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করতেন – নিম্নতম দিকগুলোও

এবং উর্ধ্বতম দিকগুলোও বিভিন্ন প্রশ্ন করার দরুন সুস্পষ্ট হয়ে পড়তো। আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে, ঐ ব্যক্তিটি জিব্রাঈলই ছিলেন কিনা, যিনি মানুষের রূপ ধারণ ক'রে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সকাশে প্রশ্ন রেখেছিলেন। কেননা, মক্কার সমাজে ওরূপ কোন পরিচিত ব্যক্তি থাকলে হযরত জাবেরের পক্ষে তার নাম উচ্চারণ করা অসম্ভব কোন ব্যাপার ছিল না। সেজন্য, কোন হাদীসে তার নামের উল্লেখ থাকলে তা ভিন্ন কথা, নইলে আমার কিন্তু ধারণা হচ্ছে, জিব্রাঈলের ওরূপে ধর্ম শিখাবার একটা পদ্ধতি ছিল।

সুনানে আত্-তিরমিযী, কিতাবুস্-সওম, 'রমাযান মাসে শয়তানদের শৃঙ্খলিত হওয়া এবং জান্নাতের দুয়ারগুলো উন্মুক্ত হওয়া' সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইহাও এমন একটি হাদীস, যা আমি প্রায়শঃ প্রত্যেক রমাযানে জমুআর খুৎবায় রমাযানের সূক্ষ্ম ও জরুরী বিষয়াবলীর দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করে থাকি। এখন আবারও হাদীসটি আপনাদের শোনাবো। বস্তুতঃ প্রত্যেক বার যে পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে তা পুনরাবৃত্তিই বটে, কিন্তু প্রত্যেকবারই তাতে নতুন বিষয়-বস্তুরও উন্মোচন ঘটে থাকে, যা আগে বর্ণিত হয় নি। এবং যে-সব নেক কথার পুনরাবৃত্তি করা হয় তা থেকে আল্লাহ্তাআলা নিষেধ করেন নি। বরং এর জন্য বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেনঃ "ফা-যাক্কের ফা-ইন নাফায়াতেয্ যিকরা"–ধর্মের মৌলিক ও জরুরী বিষয়াবলী বার বার উল্লেখ কর এবং সেগুলোর উপর গুরুত্বারোপ ক'রে বহুলভাবে বর্ণনা কর যাতে সেগুলো মানুষের অন্তরে দাগ কাটে এবং স্থিতিশীল হয়। যারা হয়তো এগুলো বার বার শ্রবণ করে থাকেন, তাঁদের চিন্তা করা উচিত, এক বছর পর ওগুলো তাদের স্মৃতিপট থেকে বিস্মৃত হয়ে পড়েছে, কাজেই "ফা-যাক্কের"-এর দাবী হচ্ছে তাদেরকে যেন পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "মাহে-রমাযানের প্রথম রাত উদিত হতেই শয়তানদেরকে এবং অবাধ্য ও অহংকারী জ্বিন্দেরকে শিকল পরিয়ে দেয়া হয় এবং আগুনের দরোজাগুলোকে রুদ্ধ করে দেয়া হয় – ওগুলোর একটিও খোলা রাখা হয় না।"

এ হাদীসটিকে যদি আপনারা সত্য ও সঠিক বলে মনে না করেন তাহলে তা ভ্রান্ত ধারণা। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অসত্য কোন কথা বর্ণনা করতেই পারেন না। এখন আপনারা নিজেদের চারপাশে – যেমন, লণ্ডনের অলি-গলিতে দেখুন না কেন এবং সমস্ত ইউরোপ-আমেরিকা– এগুলো তো দূরে থাক, পাকিস্তান,ভারত ও বাংলাদেশে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে রমাযান চলাকালে যে-সব অনাচার হতে থাকে এবং নির্লজ্জতার কার্যকলাপ চলে, অদ্যকার পত্রিকাই খুলে দেখুন ও–সব সম্পর্কে খবরা খবরে তা ভর্তি রয়েছে – হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ-গণধর্ষণ ও নিষ্পাপ শিশু ও নিরীহ নারী ও বৃদ্ধদের নিধন – এ সব কিছুর মধ্যে কোন একটিকেই চিহ্নিত করে বলুন যে, রমাযানের পূর্বে তো মুসলমানরা তাতে পুরাদমে লিপ্ত ছিল, কিন্তু এখন (রমাযানে) তা থেকে তারা নিবৃত্ত হয়েছে। সুতরাং এই পবিত্র হাদীসটি কী অর্থ বহন করে? "যখন রমাযানের প্রথম চাঁদ উদিত হয় তখন শয়তানদেরকে এবং উদ্ধত জ্বিনদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয় এবং আগুনের দরোজাগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হয়, সেগুলোর একটিও খোলা রাখা হয় না।" এ হাদীসটির সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অর্থ এই যে, খোদাতাআলার ঐ সকল পুণ্যবান বান্দা যাদেরকে রমাযান ছাড়া অন্যান্য সময় শয়তান বিভ্রান্ত করতে গিয়ে কখনও কখনও সফলও হয়ে থাকে এবং অবাধ্য ও অহংকারী জ্বিন অর্থাৎ বড়োলোকেরা নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্বারা সত্য-পথ থেকে বিচ্যুত ও বিপথগামী হতে বাধ্য করে – এই বান্দারা যদি খোদাতাআলার সত্যিকার বান্দা হয়ে থাকেন, তাহলে রমাযানের প্রথম রাতেই তাদের মধ্যে এক মহা পরিবর্তনমূলক জাগরণের সৃষ্টি হয় এবং তারা সব শ্রেণীর শয়তানদের বিরুদ্ধে তৎপর ও সচেতন হয়ে ওঠেন, সকল প্রকার বেহুদা ধ্যান-ধারণার প্রতিরোধে নিজেদের সুচেতনা ও সমস্ত শক্তি-সামর্থ্যকে নিয়োজিত করেন এবং কোনও অবাধ্য-উদ্ধত জ্বিন অর্থাৎ জাগতিকভাবে বড়োলোকের সাধ্যে কুলোয় না ঐ বান্দাদের জীবনে কোনও কু-প্রভাব বিস্তার করতে। মাহে-রমাযানে আল্লাহ্তাআলার মু'মিন বান্দারা যে নিজেদেরকে কীভাবে খোদাতাআলার দিকে Withdraw করে, (তাঁরই সমীপে আত্মসমর্পিত হয়)-নিজেদেরকে সব দিক থেকে গুটাতে গুটাতে যেন খোদার কোলে গিয়ে বসে পড়ে। এরাই হচ্ছে ঐ সকল বান্দা, যাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন যে, জাহান্নামের কোন একটি দরোজাও তাদের পক্ষে খোলা থাকে না। সম্পূর্ণরূপে উহার প্রত্যেকটি দুয়ার বন্ধ হয়ে যায় "এবং আহ্বান বা ঘোষণাকারী ঘোষণা করে, হে অনিষ্টকারী! থেমে যা। যাদেরকে আগুন (জাহান্নাম) থেকে মুক্ত সাব্যস্ত করা হয় তারা হয়ে থাকে আল্লাহ্র অনুগত দাস (বান্দা)। ঐ আহ্বান বা ঘোষণা (রমাযানের) প্রত্যেক রাত্রে হয়ে থাকে।" বস্তুতঃ প্রত্যেকটি হাদীস নিজের সমাধানের (উহার সঠিক অর্থ প্রকাশের) চাবিকাঠি নিজের মধ্যেই বহন করে থাকে; সুতরাং উহার যে অংশ বা বাক্যটি এখন আমি পাঠ করলাম উহাতেই সেই চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে। "ইবাদুল্লাহ্, ইবাদুর রহমান"-দের বিষয়ই হাদীসটিতে আলোচিত হয়েছে। যাদেরকে মুক্তিদান করা হয় তারা আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাই হয়ে থাকেন। "এবং ওরূপ ধ্বনি প্রত্যেক রাত্রিতেই উত্থাপিত হয়" – এ বাক্যটিতে আমাদের জন্য সুসংবাদ নিহিত রয়েছে যে, রমাযানের প্রথম রাতে আমাদের সাথে যদি ওরূপ না ঘটে থাকে, তাহলে যেহেতু রমাযানের প্রত্যেক রাতেই তদ্রূপ হয়ে থাকে – আল্লাহ্র ফিরিশতারা অবতীর্ণ হয়ে থাকেন তারা ঘোষণা করেন যে, এখনও যারা আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হতে চাও, যদি তোমরা শয়তানের বাঁধন থেকে মুক্ত হতে চাও, তাহলে চলে এসো। যদি তোমরা আজই খোদার (অনুগত) বান্দা হবার সিদ্ধান্ত ও সংকল্প গ্রহণ কর, তাহলে আজকের রাত তোমাদের মুক্তির রাত হিসেব সাব্যস্ত হবে। এ হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে সারা রমাযান ব্যাপী চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষেত্রে। অতএব, প্রত্যেকের উচিত প্রত্যেক রাতে আত্মপর্যালোচনা করা যে, এই রাত তার জন্য মুক্তিলাভের বাণী বহন করে এসেছে কি না। তার জন্য শয়তানদের শৃঙ্খলিত হবার বাণী বয়ে নিয়ে এসেছে কি না। মু'মিনদের মুক্তির আর শয়তানদের শৃঙ্খলিত হওয়া প্রকৃতপক্ষে একই অর্থ বহন করে, কেননা দু'টো একই সঙ্গে সংঘটিত হয়। এর পরবর্তী হাদীসটিও প্রত্যেক রমাযানেই সাধারণতঃ আলোচিত হয়।

কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে সব কথাই হয়ে থাকে আঁ হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র বাণীকে কেন্দ্র করেই। তাঁর প্রত্যেকটি বাণীই অত্যন্ত গভীর ও মহামর্যাদা-সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং যে-সব কল্যাণকে আহরণ ও যে-সব অ-কল্যাণ থেকে আত্মরক্ষা আবশ্যকীয়, সে-দিক দিয়ে তাঁর পবিত্র বাণীগুলো অত্যন্ত সহায়ক সাব্যস্ত হয়। ঐ সকল হাদীসের মধ্যে একটি ইহাও যে, হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, 'মানুষের সব কাজ তার নিজের জন্য হয়, কিন্তু রোযা কেবল আমার খাতিরেই হয়ে থাকে এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান বা পুরস্কারস্বরূপ হবো। তার এই (রোযাবৎ) পুণ্যের দরুন তাকে আমার দীদার বা দর্শন দান করবো।' তিনি আরও বলেন, "রোযা ঢালস্বরূপ"। অতএব, তোমাদের মধ্যে কোনও রোযাদার ব্যক্তি যেন কোন বৃথা ও বেহুদা কথা না বলে, শোর- গোলও যেন না করে, গালাগালিও না করে।"

বস্তুতঃ নবীই আমানতের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততার যথাযথ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অন্যেরা তদ্রূপ করে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) উক্ত বিষয়টিকেই এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, "খাযায়েন যো হাযারোঁ সাল সে মদফূন থে/ আব ম্যাঁয় দেতা হুঁ গার হো কোই উমীদওয়ার।" (–'যে ভাণ্ডার হাজার হাজার বছর ধরে সমাধিস্থ ছিলো। এখন আমি তা বিতরণ করছি যদি কোন প্রত্যাশী পাওয়া যায়।") যে-সব রত্নভাণ্ডার খোদাতাআলার কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়, সেগুলোর ধারক ও বাহক হয়ে থাকেন নবীরা। রসূলল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ "রোযাদারকে কেউ যদি গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে তাহলে সে যেন বলে, আমি রোযা রেখেছি। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, সেই মহান সত্তার কসম! রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র কাছে মৃগনাভির চেয়েও অধিক প্রিয় এবং পবিত্র।" কেননা, আল্লাহ্র খাতিরে তার তদ্রূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। "বস্তুতঃ রোযাদার মু'মিনের জন্য দু'টি আনন্দ নির্ধারিত। একটি সে তখন লাভ করে যখন সে রোযা 'ইফতার' করে অর্থাৎ খোলে। অপর আনন্দটি সে তখন লাভ করবে যখন রোযার দরুন সে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভ করবে।" অর্থাৎ যে স্বাদ ইফ্তারের সময় উপভোগ হয় তা রোযাদারই জানে যে, কতো উৎফুল্ল হয় সে। পানির প্রত্যেকটি বিন্দু তখন অতি প্রিয় ও সুস্বাদু হয়ে থাকে। তার আত্মার পক্ষে আনন্দ লাভ তো তখন হবে যখন সে খোদাতাআলার সাক্ষাৎ লাভ করবে এবং তার আত্মার সম্পূর্ণ তৃষ্ণা নিবারণ করা হবে।

এ হাদীসটি অত্যন্ত গভীর অর্থ বহন করে। হাদীসটিতে রোযা রেখে সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন সম্ভাব্য রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে এই বলে যে, রোযা থাকাকালীন তুমি পরীক্ষারও সম্মুখীন হবে। কেউ সীমালঙ্ঘন করে বসবে। কেউ কঠোর ব্যবহার করবে। তখন তুমি রোযা রেখেছ। কাজেই এ কথা ছাড়া অন্য কোন উত্তর দিবে না বা অন্য কোন কথা উচ্চারণ করবে না। এরপর রোযাদার ব্যক্তির মুখের দুর্গন্ধের উল্লেখ করা হয়েছে। ইহা কেন করা হলো? এর সঙ্গে পূর্বাপর কথার কী সম্পর্ক বিদ্যমান? সম্পর্ক এটাই যে, তুমুল ঝগড়া-ঝাটির সময়ও যে-ব্যক্তি তার মুখ বন্ধ রাখে, বেহুদা কথা বলতে নিজেকে সংবরণ করে খাদ্য ও পানীয় থেকেও মুখ বন্ধ রাখে, সেজন্য তার মুখ আল্লাহ্র খাতিরেই বন্ধ থাকে। আর যখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুখ বন্ধ থাকে তখন তাতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। এক দিকে বলছেন, তাকে বলে দাও যে, তুমি আল্লাহ্র খাতিরে নীরব থাকবে। অন্য দিকে না খাওয়ার দরুন রোযাদারের মুখে যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়, আল্লাহ্ বলছেন যে, তার মুখের ঐ দুর্গন্ধ আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত প্রিয় বোধ হয়। সুতরাং হাদীসটিতে বর্ণিত সব কথা পরস্পর গভীর সম্পর্ক-সূত্রে সুবিন্যস্ত। আঁ হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র উক্তি উহার মধ্যে পারস্পরিক সুসামঞ্জস্য পূর্ণতার দ্বারা নিজের পরিচয় নিজেই দিয়ে থাকে। এ হাদীসটিতে তা সুস্পষ্টতঃ প্রকাশ পায়। গভীরভাবে চিন্তা করলে তা আপনাদের কাছেও প্রকাশ পাবে। 'খোদাতাআলা রোযাদারের জন্য কেন প্রতিদান ও পুরস্কারস্বরূপ হয়ে যান' – এ বিষয়টির পর্যালোচনা করা হয়েছে এ হাদীসটিতে। সুতরাং এর কারণ বলা হয়েছে যে, খোদাতাআলার খাতিরে সে তার অবস্থা তদ্রূপ করেছে। বস্তুতঃ মু'মিন তার মুখের গন্ধের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন হয়ে থাকে। আঁ হযরত (সাঃ)-এর মুখ দিয়ে সর্বদা সুগন্ধ ছড়াতো। পবিত্র লালার দরুন যে পবিত্র এক সুবাসের সৃষ্টি হয়, ওটাকে যদি আপনি সুগন্ধ না-ও বলেন, তবু যিনি তার মুখ সদাসর্বদা পরিষ্কর রাখতে যত্নবান থাকেন তাঁর নিঃশ্বাসে তাঁর মুখ থেকে যে স্বাভাবিক-সহজাত গন্ধ তরঙ্গায়িত হয় তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। সুতরাং আঁ হযরত (সাঃ) তাঁর মুখগহ্বর আল্লাহ্তাআলার খাতিরে এতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সদা এতো যত্নবান থাকতেন যে, তা থেকে পবিত্র লালার সুগন্ধ ছাড়া অন্য কিছুই ছড়াতো না। অতএব, যিনি তা সত্ত্বেও রোযা রেখে নিজের তদ্রূপ অবস্থা করেন যা হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে– তাতে আমার মনে হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের দিকেই ইঙ্গিত করছেন এই বলে যে, "আমি কতো পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র, কিন্তু রোযা রাখার দরুন হয়তো আমার মুখেও স্বভাবতঃ কিছুটা দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে, যা থেকে আমি কতো সাবধান থাকার চেষ্টা করি। কিন্তু তা আমার কাছে অত্যন্ত অপসন্দ হলেও আমি খোদার খাতিরে নিজের জন্য তা-ও বরণ করে নিয়েছি।" খোদার খাতিরে তাঁর এই অবস্থা বরণের কথা ভেবেই আমি অভিভূত হচ্ছি। (হুযূর ভারাক্রান্ত কণ্ঠে এ বাক্যটি উচ্চারণ করেন। অনুরূপ আরও বলেন,) এ হাদীসটির অন্তর্নিহিত উক্ত বাক্য মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সেই পবিত্র স্মৃতিকে হৃদয়-পটে উদ্ভাসিত করে এবং সেই রোযাদারকে সম্মুখে নিয়ে আসে, যার জন্য দু'টি আনন্দ নির্ধারিত। নিশ্চয় এরূপ রোযাদার যিনি খোদার (দেওয়া) রিয্কের উপর ইফ্তার করেন তাঁর দেহ ও মনের যে মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি হয় তা দুনিয়ার কোন ব্যক্তি কখনও কল্পনাও করতে পারে না। তদুপরি যিনি প্রত্যহ খোদার সাক্ষাতলাভ করেন, রোযার প্রতিদানস্বরূপ পরিপূর্ণ পুরস্কারে তাঁকে ভুষিত করা হয় অর্থাৎ দ্বিগুণ আনন্দ এবং সকল প্রকার পবিত্রতা তাকে দান করা হয়। এ সেই বিষয়-বস্তু, যা এ হাদীসটি আমাদের সামনে খোলাসা ক'রে উপস্থাপন করেছে। আমার মনে হয়, খুব কম লোকের দৃষ্টিই এ দিকে আকৃষ্ট হয় যে, এখানে প্রকৃতপক্ষে আঁ

হযরত (সাঃ) নিজের অবস্থারই বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

অতঃপর, সহী বুখারীর "কিতাবুস্ সওমে বাবু রাইয়ানিস-সায়েমীন" থেকে হযরত সাহ্‌ল বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে যে, আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, "জান্নাতে একটি দরোজা আছে যা 'রাইয়ান' নামে অভিহিত। কিয়ামত দিবসে রোযাদার ঐ দরোজাটি দিয়ে প্রবেশ করবে। তাদের ব্যতীত অন্য কেউ এর মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। জিজ্ঞেস করা হবে, রোযাদারগণ কোথায়? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত অন্য কেউ এর মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করবে না। তারা সবাই প্রবেশ করার পর উহা বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর, আর কেউ এর মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করবে না।" কিন্তু অন্যান্য হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, জান্নাতের সাতটি দরোজা আছে। ঐ সবগুলো খোদার ঐ বান্দাদের জন্যে খোলা রয়েছে যারা ঐ সব দরোজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার অধিকার রাখে। এ বিষয়টিতে এ রকম আরও হাদীস রয়েছে, যেগুলো থেকে জানা যায় যে, জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য অগণিত পথ রয়েছে, যে-গুলো দিয়ে মু'মিনগণ পরিচালিত হয়ে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সে-জন্যে এ হাদীসগুলোকে বাহ্যিক (স্থূল-ভৌতিক) অর্থে মনে করবেন না এই বলে যে, তারা একটি গেট দিয়ে প্রবেশ করে আরেকটি দিয়ে বেরুবে, অনুরূপভাবে আরেকটি দিয়ে ঢুকে পরবর্তীটি দিয়ে বেরুতে থাকবে – ওরূপ মনে করাটা বাহ্যিক (–স্থূল ও ভৌতিক) অর্থের পুজারীদের বৃথা ও বেহুদা কথাবার্তা বৈ অন্য কিছু নয়। আঁ হযরত (সাঃ) যে-বিষয়টির উল্লেখ করছেন তা আপনারা এরূপ বলে ধরে নিন যে, ঐ সমস্ত দুয়ার যেন একটি গেট হিসেবে প্রকাশিত হবে। যে-সব পুণ্যের দুয়ার দিয়ে যে-সব মু'মিনের প্রবেশ করা উচিত ঐ সব দুয়ারে যেন ঐ সব পুণ্যের ল্যাবেল লাগানো থাকবে এবং খোদার দৃষ্টিতে যারা প্রকৃত রোযাদার হবে তাদের দরোজাও সে গেটেই অবস্থিত হবে – যদি আপনারা বাহ্যিকভাবে গেটের কল্পনা আবশ্যকীয় বলেই মনে করেন তাহলে তা ওরূপ বলে ধরুন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা বাহ্যিক (ও স্থূল) কল্পনার বিষয় নয়, বরং রূহানী বা আধ্যাত্মিকরূপে মানুষ তার প্রত্যেক পুণ্যের পুরস্কারকে যেন এক একটি দুয়ার রূপে প্রত্যক্ষ করবে, কিন্তু সেগুলো কোন বাহ্যিক বা ভৌতিক গেট বা দরোজাস্বরূপ হবে না। বস্তুতঃ প্রত্যেক মু'মিনের আত্মা অনুভব করবে যে, তার প্রত্যেক পুণ্যের পুরস্কার তাকে প্রদান করা হচ্ছে এবং সে এরূপ জান্নাতে প্রবেশ করছে যেখানে কোন একটি পুণ্যও উপেক্ষিত হয় নি। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও অর্থ করা এ সব হাসীসের মর্মবাণীর পরিপন্থী হওয়ারই নামান্তর।

অতঃপর, কোন কোন লোকের কাছে রোযার একটি উপকার হয়তো ওরূপ বলেও পরিলক্ষিত হতে পারে যার দিকে তারা অবশ্য-অবশ্যই স্বভাবতঃ আকৃষ্ট ও ধাবিত হতে পারেন। কেননা, ঐ উপকারটি হচ্ছে মানব প্রকৃতিসম্মত। যেমন, মানুষ চেষ্টা করে যাতে তার অর্থ-সম্পদে বরকত ও প্রবৃদ্ধি ঘটে। আর এই বরকত লাভের অন্বেষায় দেখুন যে, সে কতো অকল্যাণের অংশীদার হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সে তার ঘর থেকে এই বরকত অন্বেষায় বের হয় কিন্তু সারা দিন চেষ্টা করে সে অবশেষে অজস্র অকল্যাণের এক বোঝা বয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে। কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ) বলেন যে, রোযার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তোমাদের ধন-সম্পদে বরকত ও কল্যাণ দান করবেন। কীরূপে করবেন তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। তবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী আপনাদের আমি পাঠ করে শুনিয়ে দিচ্ছি। সাহ্‌ল বিন মাআয-তাঁর পিতার কাছে শুনে বর্ণনা করছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "নামায, রোযা এবং ফিক্‌রে-ইলাহী আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়কৃত অর্থকে সাতশ' গুণ বাড়িয়ে দেয়।" এই সাতশ' গুণ বৃদ্ধির বাকধারাটি এরূপ এক প্রচলিত বাকধারা, যার ভিত্তি রয়েছে কুরআন করীমে এবং এমনিও ইহা ধন-সম্পদের আধিক্যের দিকে ইঙ্গিত বহন করে। হাদীসটিতে অর্থ বৃদ্ধির যে পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে তা বিশেষ মনোনিবেশে শ্রবণযোগ্য। কীরূপ ব্যক্তির কোন্ অর্থ-সম্পদে আল্লাহ্ বরকত ও কল্যাণ দান করবেন? অর্থাৎ আপনারা যে ব্যবসা-বাণিজ্য করবেন তাতে রোযা রাখার দরুন বরকত দানের কথা বলা হয় নি। বরং খোদাতাআলার পথে যে অর্থ আপনারা ব্যয় করবেন রোযাদার ব্যক্তির সেই অর্থে বরকত ও কল্যাণ দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। সেই অর্থ ঐরূপে বৃদ্ধিলাভ করার সম্পর্কে আমাদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এই যে, ইহা কেবল পারলৌকিক প্রতিশ্রুতি নয়, বরং এই দুনিয়াতেও ওরূপই ঘটে থাকে যে, আল্লাহ্‌র পথে যারা ব্যয় করে থাকে, তাদের ধন-সম্পদে মৃত্যুর পরে নয় বরং ইহজীবনেই অবধারিতভাবে বরকত ও কল্যাণ দান করা হয়। কিন্তু এই ব্যবসা একটি ভিন্ন ধরনের ব্যবসা। ইহা 'কর্যা-হাসানা' বা উত্তম ঋণ দানের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়; যে সম্বন্ধে আমি বিগত খোৎবায় বর্ণনা করেছি। আপনারা খোদার পথে ব্যয় করতে ভয় করবেন না। বস্তুতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিশেষতঃ রমাযান মাসে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার ক্ষেত্রে তীব্রবেগে প্রবাহিত বায়ুর চেয়েও তীব্রতর হয়ে পড়তেন। এ সম্পর্কে এরূপ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যেমন সাধারণ গতিতে যে বাতাস বয়ে থাকে তা যখন প্রবল ঝড়ো বায়ুপ্রবাহে পরিণত হয় যেন তার চেয়েও প্রবল বেগে তিনি আল্লাহ্‌র পথে খরচ করতেন। সুতরাং তাঁর এই সুন্নত আমাদের এই শিক্ষাদান করে যে, পবিত্র মাহে-রমাযানে তোমরা সেরূপে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করো, যেরূপে সাধারণ বায়ু প্রবাহের তুলনায় তীব্রতর গতিতে প্রবাহিত বায়ুর ধাক্কায় যেন দ্রুত সম্মুখে এগোতে থাকো। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন যে, তোমরা যদি ওরূপ কর, তাহলে তোমাদের ধন-সম্পদে প্রভূত বরকত ও কল্যাণ সাধিত হবে।

(ওডিও ক্যাসেট থেকে অনূদিত)

অনুবাদঃ মওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ,
সদর মুরব্বী –ঢাকা।

আল্লাহ্‌তাআলার পবিত্র সত্তা

(প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর অমৃতবাণীর ভাণ্ডার থেকে আহরিত)

(১)

"সেই যে খোদা যিনি সমস্ত নবীগণের উপরে প্রকাশিত হয়ে আসছিলেন, যিনি হযরত মূসা কলীমুল্লাহ্ (আঃ)-এর উপরে তূর পাহাড়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন, যিনি হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর উপরে সেঈর পাহাড়ের উর্ধ্বে উদিত হয়েছিলেন এবং যিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপরে জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত করেছিলেন ফারান-এর গিরি 'পরে, সেই সর্বশক্তিমান পবিত্র খোদা-ই আমারও উপরে তাঁর জ্যোতিঃ প্রকাশিত করেছেন। তিনি আমার সাথে কথা বলেছেন। তিনি আমাকে বলেছেন, সেই যে সর্বোচ্চ অস্তিত্ব যাঁর উপাসনার জন্য তামাম নবীগণকে প্রেরণ করা হয়েছিল, সে আমি-ই। আমি-ই একমাত্র স্রষ্টা এবং অধিপতি, আমার কোন শরীক নাই এবং আমি জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ থেকে পবিত্র" (যামিমাহ্ রিসালাহ্ জিহাদ, পৃঃ ৮)।

(২)

"সেই পবিত্র জীবন, যা পাপ থেকে মুক্ত থাকলে পাওয়া যায়, তা এক দ্যুতিময় লাল মুক্তো বা পদ্মরাগ মণি যা এখন কারোর কাছেই নেই। তবে, হ্যাঁ, খোদাতাআলা সেই দ্যুতিময় পদ্মরাগ মণি আমাকে দিয়েছেন; এবং তিনি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট 'মা'মুর' করেছেন যেন আমি দুনিয়াকে সেই দ্যুতিময় পদ্মরাগ মণি লাভের পথ দেখিয়ে দেই। আমি দৃঢ় আস্থার সঙ্গে ঘোষণা দিচ্ছি যে, এই পথে চললে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিশ্চয় সেই মুক্তো লাভে সমর্থ হবে। এবং এই মুক্তো যে মাধ্যমে ও যে পথে লাভ করা যায় তা এক-ই, যাকে বলা হয় খোদাকে চেনার, সাচ্চা মা'রেফাত বা সত্য জ্ঞান ও উপলব্ধি। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই প্রশ্নটি একটি অত্যন্ত কঠিন ও নাজুক প্রশ্ন। কেননা, এটি একটি কঠিন বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন (মস্‌আলা)। ফিলোসফার বা দার্শনিকরা (যেমন আমি পূর্বেই বলে এসেছি) আসমান ও যমীনের প্রতি লক্ষ্য করে এবং বিশ্বজগতের সৃষ্টির সুন্দর শৃংখলা, বিন্যাস ও নিয়ন্ত্রণ অবলোকন করে শুধু এতটুকুই বলতে পারেন যে, একজন সৃষ্টিকর্তা থাকাই সম্ভব। কিন্তু, আমি তাদেরকে এর চাইতেও উর্ধ্বের স্তরে উন্নীত করেছি এবং নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি যে, খোদা **বাস্তবিকই আছেন**" (মলফুযাত, খ. ৩, পৃঃ ১৬)।

(৩)

"আমাদের খোদা-ই আমাদের বেহেশ্‌ত। আমাদের সব চাইতে বড় আনন্দ আমাদের খোদাতেই। কেননা, আমরা তাঁকে দেখেছি এবং তাঁর মধ্যেই সমস্ত সৌন্দর্য অবলোকন করেছি। এই সম্পদই গ্রহণের যোগ্য, যদি তা প্রাণেরও বিনিময়ে পাওয়া যায়। এবং এই পদ্মরাগ মণি ক্রয় করারই যোগ্য, যদি তা নিজের সমগ্র অস্তিত্বের বিনিময়েও পাওয়া যায়। হে বঞ্চিতগণ! এই ঝর্ণার কাছে দৌড়ে এসো, ইহা তোমাদেরকে পরিতৃপ্ত করবে। এ হচ্ছে জীবনের ঝর্ণা, এ তোমাদেরকে বাঁচাবে। আমি কী করি! আমি কেমন করে এই সুখবর হৃদয়গুলোতে প্রবেশ করাই! আমি কোন্ সে ঢেঁড়া পিটিয়ে বাজারে ও বন্দরে ঘোষণা করি যে, এই তো তোমাদের খোদা, যাতে করে লোকেরা তা শোনে! এবং আমি কোন্ সে ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করি, যাতে লোকেদের কান খোলে!" (কিশ্‌তী-এ-নূহ্, পৃঃ ৩০)।

(৪)

"খোদা যমীন ও আসমানের নূর-আলো। অর্থাৎ প্রত্যেক আলো, তা সে পর্বতের শৃঙ্গের উপরেই হোক আর উপত্যকাতেই হোক, তা আত্মার ভেতরেই হোক, আর দেহেই হোক, ব্যক্তিক হোক আর নৈর্ব্যক্তিক হোক, এবং তা জাহেরী হোক আর বাতেনী হোক, মনের মধ্যেই হোক আর বাইরে হোক, তা সবই তাঁরই ফয়েয বা কল্যাণের দান। এতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, জগতসমূহের প্রভু প্রতিপালকের অর্থাৎ রব্বুল আলামীনের ফয়েযে আম বা সাধারণ কল্যাণ ও কৃপা সমস্ত কিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে। কেউই তাঁর কৃপা ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত নয়। তিনিই যাবতীয় কৃপা ও কল্যাণের উৎস, সকল আলোর চূড়ান্ত কারণ, তামাম রহমতের উৎস-প্রসবণ। তাঁরই সত্য অস্তিত্ব সমগ্র বিশ্ব জাহানের ভরসা এবং ছোট বড় সমস্ত কিছুর আশ্রয়স্থল। তিনিই সেই, যিনি প্রতিটি জিনিসকে অনস্তিত্বের অন্ধকার গহ্বর থেকে বের করে এনেছেন এবং অস্তিত্বের পরিচ্ছদে ভূষিত করেছেন। তিনি ছাড়া এমন আর কোন অস্তিত্ব নেই, যা স্বয়ং নিজের থেকেই বিদ্যমান ও অনাদি প্রাচীন এবং যা তাঁর থেকে কৃপা ও কল্যাণপ্রাপ্ত নয়। বরং, ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল, মানব ও প্রাণীকুল, প্রস্তর ও বৃক্ষরাজি এবং সকল আত্মা ও দেহ, সবই তাঁরই কৃপা ও কল্যাণরাশি থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে" (বরাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃঃ ১৮১, পাদটীকা)।

(৫)

"ইসলামের খোদা হচ্ছে সেই খোদা যিনি কানুনে কুদরত বা প্রাকৃতিক নিয়ম-এর আয়নায় এবং ফিৎরত বা স্বভাবের গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হচ্ছেন। ইসলাম কোন নতুন খোদাকে পেশ করেনি, বরং সেই খোদাকেই পেশ করেছে যাকে পেশ করে চলেছে মানুষের হৃদয়ের আলো, মানুষের বিবেক এবং যমীন ও আসমান" (তবলীগে রেসালত, খঃ ৬, পৃঃ ১৫)।

(৬)

"সেই শক্তিমান এবং সত্য এবং কামেল খোদাকে আমাদের আত্মা এবং আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু সিজ্‌দা করে চলেছে, যাঁর হস্ত দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছে প্রত্যেকটি আত্মা এবং সৃষ্টির

প্রত্যেকটি পরমাণু তাদের সমস্ত শক্তি ও বৃত্তিসহ। এবং যাঁর অস্তিত্বের কারণেই কায়েম রয়েছে বাকী সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানেরও বাইরে নেই, তাঁর নিয়ন্ত্রণেরও বাইরে নেই, তাঁর সৃষ্টিরও বাইরে নেই। এবং হাজারো দরূদ ও সালাম এবং হাজারো রহমত ও বরকত সেই পবিত্র নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর ওপরে, যাঁর মাধ্যমে আমরা সেই যিন্দা খোদাকে পেয়েছি, যে খোদা নিজে কথা বলে নিজের অস্তিত্বের নিদর্শন আমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন। এবং যিনি অতি অসাধারণ নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করে তাঁর চিরন্তন ও কামেল শক্তি ও ক্ষমতাসমূহের জ্যোতির্ময় চেহারা দেখিয়ে থাকেন। অতএব, আমরা এমন এক রসূলকে পেয়েছি যিনি আমাদেরকে খোদা দেখিয়েছেন। এবং আমরা এমন খোদাকে পেয়েছি যিনি তাঁর কামেল শক্তির দ্বারা প্রত্যেকটি জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কুদরত ব্যতিরেকে বা ক্ষমতার মধ্যে কতই না মহিমা বিদ্যমান, তাঁর কুদরত কোন কিছুই অস্তিত্বে রূপ লাভ করেনি। কোন কিছুই তাঁর সাহায্য ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। তিনিই আমাদের সত্য খোদা, তিনি অন্তহীন কল্যাণের অধিপতি, অন্তহীন ক্ষমতার অধিকারী। তিনি অনন্ত সৌন্দর্যের আকর। তিনি অনন্ত কৃপা ও করুণার উৎস। তিনি ছাড়া আর কোনও খোদা নেই" (নাসীমে দাওয়াত, পৃঃ ৩)।

(৭)

"খোদাতালার সত্তা অদৃশ্য থেকেও অদৃশ্য এবং অতিক্রান্ত থেকে অতিক্রান্ত এবং অত্যন্ত গোপন, যাকে শুধু মানবীয় যুক্তির বা আকলের দ্বারা আবিষ্কার করা কোনমতেই সম্ভব নয়। কোন প্রকার যুক্তিই তাঁর সত্তা প্রমাণের পক্ষে অকাট্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। কেননা, আকল্ বা যুক্তির দৌড় ও বিচরণের সীমা শুধু এতটুকুই প্রসারিত যে, এই বিশ্বজগতের প্রতি তাকিয়ে মনে হচ্ছে যে, এর কোন স্রষ্টা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু, প্রয়োজনকে অনুভব করা এক কথা আর সেই নিশ্চিত জ্ঞানের স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া যে, যে খোদার প্রয়োজনীয়তা বোধ করা হচ্ছে সেই খোদা সত্যসত্যই অস্তিত্ববান, তা ভিন্ন কথা। এবং যেহেতু, যুক্তি-বুদ্ধির পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ এবং সন্দেহযুক্ত, যেহেতু প্রত্যেক ফিলোসফি বা দর্শন কেবল যুক্তির মাধ্যমে খোদাকে সনাক্ত করতে পারে না। বরং সেইসব লোকেরা যারা শুধু যুক্তির সাহায্যেই খোদাকে চিনতে চায়, তারা অবশেষে নাস্তিক হয়ে যায়। তখন, যমীন ও আসমানের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করলেও তাদের কোনও ফায়দা হয় না। তারা খোদাতাআলার লোকদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা শুরু করে দেয়। তারা একটা যুক্তি দেখাতে থাকে যে, পৃথিবীতে এমন হাজারও জিনিস পাওয়া যায় যেগুলোর অস্তিত্ব আমাদের কোনও কাজেই আসে না। এবং যেগুলোর সৃষ্টি হওয়া থেকে এমন কোন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, আসলেই কোন স্রষ্টা আছেন। বরং সেগুলো এমনিতেই অস্তিত্ববান এবং সেগুলো বৃথা এবং অনাবশ্যকও বটে।

আফসোস! ঐ মূর্খেরা জানে না যে, **জ্ঞানের শূন্যতা থেকে অস্তির শূন্যতা প্রমাণিত হয় না** (অর্থাৎ, একটা কিছুকে না জানলেই সেটা নাই হয়ে যায় না)। এই ধরনের লোক এই যামানায় লাখো লাখো সংখ্যায় পাওয়া যাবে যারা নিজেদেরকে মনে করে যে, তারা খুব বুদ্ধিমান, বড় ফিলোসফার, তারা তাই খোদাতাআলার অস্তিত্বকে সরাসরি অস্বীকার করে। আর যদি মহামহিম স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে কোন যুক্তিগ্রাহ্য সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা তাদেরকে পরাস্ত বা দোষী সাব্যস্ত করা যেত, তাহলে তারা অমন নির্লজ্জভাবে হাসি-ঠাট্টার সাথে খোদাতাআলার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারতো না। অতএব, কোন ব্যক্তি ফিলোসফির নৌকোয় চড়ে সংশয়ের তুফান থেকে পরিত্রাণ পেতে পারবে না। বরং, সে ডুবে মরবেই। এবং সে কোনক্রমেই খাঁটি তৌহীদের শরবত পানে তৃপ্ত হতে পারবে না। এখন ভেবে দেখো যে, এইরূপ চিন্তা কত বেশি ভ্রান্ত ও দুর্গন্ধময় যে, নবী সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর উছিলা ছাড়াই তৌহীদ লাভ করা যায়, এবং এর ফলে মানুষ পরিত্রাণ লাভ করতে পারে? হে মুর্খেরা! খোদার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস পূর্ণ না হলে, তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস কীভাবে দৃঢ় হবে? সুতরাং নিশ্চয় জেনে রাখো যে, প্রকৃত তৌহীদ কেবল নবীর মাধ্যমই লাভ করা সম্ভব। যেমন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম আরবের নাস্তিক, প্রকৃতি-পূজারী ও ভ্রান্ত ধর্মাবলম্বীদেরকে হাজারো আসমানী বা স্বর্গীয় নিদর্শন দেখিয়ে তাদেরকে খোদাতাআলার অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাসী হতে বাধ্য করেছিলেন। এবং এখনও পর্যন্ত আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর সাচ্চা ও পূর্ণ আনুগত্যকারীরা নাস্তিক ও প্রকৃতি বা সৃষ্টির উপাসকদের সামনে ঐ সমস্ত নিদর্শন প্রদর্শন করে চলেছেন। কথা এটাই সত্য যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ জীবন্ত খোদার জীবন্ত ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তান তার হৃদয় থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় না; এবং খাঁটি তৌহীদও তার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় না; এবং সে খোদার অস্তিত্বের প্রতিও অটল বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। এবং এই যে পবিত্র ও কামেল তৌহীদ, তা লাভ করা যায় কেবল আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমেই"(হকীকাতুল ওহী, পৃঃ ১১৭-১১৮)।

(৮)

"স্মরণ রেখো যে, মানুষের কোন ক্ষমতা নেই যে, মানুষ খোদাতাআলার সকল সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম কার্য সম্পর্কে অবহিত হয় বরং খোদাতাআলার কাজ তো সবই মানবীয় বুদ্ধি এবং চিন্তা এবং কল্পনারও বহু উর্ধ্বে। মানুষের তো শুধু এতটুকু জ্ঞানের বড়াই করা উচিত নয় যে, সে কার্য-কারণ প্রক্রিয়ার বা ধারাবাহিকতার একটা সীমা পর্যন্ত জেনে ফেলেছে। কেননা, মানুষের এই জ্ঞান তো নিতান্তই সীমাবদ্ধ। এবং তা বড় জোর হতে পার সমুদ্রের একবিন্দু পানির কোটি ভাগের এক ভাগের সমান। সত্য কথা হচ্ছে, খোদাতাআলা নিজে যেমন সীমাহীন, তেমনি তাঁর কাজও সীমাহীন। তাঁর কোন কাজের মৌলিকত্ব সম্পর্কে ভাজ্য মানবীয় ক্ষমতার বাইরে ও উর্ধ্বে। তবে হ্যাঁ, আমরা তাঁর চিরন্তন গুণাবলীর দিকে তাকিয়ে শুধু এতটুকু বলতে পারি যে, খোদাতাআলার গুণাবলী যেহেতু নিষ্ক্রিয় থাকে না, সেহেতু খোদাতাআলার সৃষ্টির মধ্যে শ্রেণী বিশেষে আদিমত্ব আছে অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রেণীসমূহের মধ্যে

কোন না কোন ধারা লক্ষ্য করা যায়, অর্থাৎ, খোদাতাআলার সৃষ্টি জগতে প্রজাতিসমূহের মধ্য থেকেও সব সময়েই কোন না কোন প্রজাতির অস্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছেই। তাই, ব্যক্তিক আদিমত্ব এক্ষেত্রে বাতিল হয়ে যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও খোদাতাআলার লয়কারী ও ধ্বংসকারী গুণাবলীও সর্বদা সক্রিয় রয়েছে এবং এগুলিও কখনই নিষ্ক্রিয় থাকে না। নাদান দার্শনিকেরা যদি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর জড় ও জৈব সমস্ত সৃষ্টিকে নিজেদের বিজ্ঞানের অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর আওতাভুক্ত করে নেয়ার এবং সেগুলির সৃষ্টির সূত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জোর প্রচেষ্টাও চালায়, তবু তারা এক্ষেত্রে ব্যর্থই থেকে যাবে, অক্ষম থেকে যাবে। তারা নিজেদের পদার্থ সম্পর্কিত গবেষণার ফলে যা কিছু আহরণ করতে এবং জমা করতে সমর্থ হয়েছে তা-ও তো সবই অসম্পূর্ণ, সবই ত্রুটিযুক্ত। এবং এটাই সেই কারণ যেজন্য তারা তাদের নিজেদের তত্ত্বের প্রতি বরাবর আস্থাশীল বা কায়েম থাকতে পারেনি। এবং বারবার সেগুলির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে হচ্ছে। কে জানে আরও কত পরিবর্তন সাধন করতে হবে। যেহেতু, তাদের যাবতীয় গবেষণার অবস্থা হচ্ছে, তারা তাদের সমস্ত উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে কেবল তাদের বুদ্ধি ও চিন্তার উপরেই নির্ভরশীল, এবং যেহেতু খোদার পক্ষ থেকেও কোন প্রত্যক্ষ সাহায্য তারা পায় না, সেহেতু তারা অন্ধকার থেকেও বেরিয়ে আসতে পারে না। আসলে কোন ব্যক্তিই খোদাকে চিনতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিগূঢ় জ্ঞান বা মা'রেফাতের সেই সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেখানে পৌঁছলে সে বুঝতে পারে যে, খোদাতাআলার এমন অসংখ্য কার্যাবলী রয়েছে যা কিনা মানববুদ্ধি, জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার বাইরে ও বহু উর্ধ্বে। এবং এই যে নিগূঢ় জ্ঞান, তা লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ হয় নাস্তিক বা প্রকৃতি পূজারী বা কোন সৃষ্টির উপাসক হয়ে পড়ে, নয়তো সে খোদার অস্তিত্বের প্রতিই অবিশ্বাসী হয়ে উঠে। আর যদিবা খোদাকে সে মানেও তাহলে স্রেফ সেই খোদাকেই মানে, যে খোদা তার নিজস্ব যুক্তি-বুদ্ধিজাত একটা ফলমাত্র। এবং এই খোদা সেই খোদা নয়, যে খোদা আপন তাজাল্লী বা জ্যোতির্ময়তার স্ফূরণ দ্বারা নিজের সত্তাকে নিজেই প্রকাশ করে থাকেন। এবং তাঁর ক্ষমতা বা কুদরতের রহস্যাবলী এত গভীর ও বিশাল যে, মানববুদ্ধি তার কোন কূল-কিনারা পায় না। যখন থেকে খোদা আমাকে এই জ্ঞান দিয়েছেন যে, খোদাতাআলার ক্ষমতাবলী বা কুদরতসমূহ বিস্ময়ের পর বিস্ময়ে ভরা এবং গভীরতা থেকেও গভীর এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম এবং ধ্যান ও ধারণারও বহির্ভূত, তখন থেকেই আমি ঐ লোকগুলোকে, যারা নিজেদেরকে ফিলোসফার বলে জাহির করে তাদেরকে পাক্কা কাফের বলে মনে করি। গোপন নাস্তিক বলে মনে করি। আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, আমি খোদাতাআলার বহু বিস্ময়কর কুদরত এমনভাবে প্রত্যক্ষ করেছি যে, সেগুলিকে **নাস্তি থেকে অস্তি** ছাড়া অন্য আর কোনভাবেই আখ্যায়িত করা সম্ভব নয়। যেমন, আমি এই শ্রেণীর নিদর্শনের কোন কোন দৃষ্টান্তের কথা কোন কোন সময় বর্ণনাও করেছি। কুদরতের এই লীলা যে দেখেনি, সে কী দেখেছে? আমরা তেমন কোন খোদাকে মানি না, যার কুদরত বা ক্ষমতা স্রেফ আমাদের যুক্তি-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনার বা কল্পনার সীমার মধ্যেই আবদ্ধ, এর বাইরে তার কিছুই নেই। বরং, আমরা সেই খোদাকেই মাণি যাঁর কুদরত বা ক্ষমতা তাঁর সত্তার মতই অসীম এবং অকল্পনীয় এবং অন্তহীন" (চশ্‌মা মা'রেফাত, পৃঃ ২৬৮-২৬৯)।

(৯)

"কুরআন শরীফের মধ্যে এমন সব শিক্ষাদান করা হয়েছে যা খোদাতাআলার প্রিয় বানাবার প্রচেষ্টা চালায়। তা কখনো তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে, আর কখনো বা তাঁর কৃপা ও কল্যাণরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেননা, কারো প্রতি হৃদয়ে ভালবাসার সৃষ্টি হয় তার রূপ সৌন্দর্যের কারণে এবং তার কৃপা-কল্যাণের কারণে। তাই, লিখিত হয়েছে যে, খোদা তাঁর সকল সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে এক ও অংশীবিহীন-ওয়াহেদ ও লা-শরীক। তাঁর মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি নেই। তিনি সমস্ত পূর্ণ বা কামেল গুণাবলীর সমষ্টি, সমস্ত পবিত্র কুদরত বা শক্তির প্রকাশ। সমস্ত সৃষ্টির উৎস। যাবতীয় কল্যাণের প্রস্রবণ, এবং তিনি প্রত্যেক পুরস্কার ও শাস্তির মালিক। সব কিছুই তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তিনি নিকট তথাপি দূর। তিনি দূর তথাপি নিকটে। তিনি সব কিছুর উর্ধ্বে, কিন্তু এ-ও যায় না যে, তাঁর নীচে আরও কিছু আছে। তিনি সব কিছু থেকে অতীব গোপন, কিন্তু এ কথাও বলা যায় না যে, তাঁর চাইতে অধিক প্রকাশিত কিছু আছে। তিনি জীবন্ত তাঁর আপন সত্তায় এবং সব কিছু তাঁর থেকেই অস্তিত্ববান। তিনি সমস্ত কিছুই ভরসা বা নির্ভরশিল, কিন্তু কোন কিছুই তাঁর জন্য ভরসা বা নির্ভরস্থল নয়। কোন কিছুই এমন নেই যা তাঁকে ছাড়াই নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে, কিংবা তাঁকে ছাড়া নিজে নিজেই জীবিত রয়েছে। তিনি সব কিছু-কেই পরিবেষ্টন করে আছেন, কিন্তু বলতে পারি না যে, তার পরিধি কত প্রসারিত। তিনি আসমান ও যমীনের প্রত্যেকটি জিনিসের নূর-আলো। প্রতিটি আলো তাঁরই হস্ত থেকে বিচ্ছুরিত এবং তাঁরই সত্তার প্রকাশ। তিনি সকল জগতের প্রতিপালক পরওয়ারদেগার। এমন কোন আত্মা নেই যা তাঁর পরওয়ারেশ বা প্রতিপালন থেকে বঞ্চিত এবং নিজে নিজেই অস্তিত্ববান। কোন আত্মারই এমন কোন শক্তি নেই, যা সে তাঁর থেকে লাভ না করে নিজে নিজেই অস্তিত্ববান হয়েছে। তাঁর রহমতসমূহ দুই প্রকারের ঃ

(১) এক হচ্ছে সেই রহমতসমূহ যা কোন কর্মীর কর্মের ফল নয়, বরং সবই আদিকাল থেকেই প্রকাশিত। যেমন, পৃথিবী ও নভোমণ্ডল, সূর্য এবং চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজি, পানি ও অগ্নি ও বায়ু এই জগতের সমস্ত কিছু যা সৃষ্টি করা হয়েছে আমাদের আরামের জন্যে; এবং তেমনিভাবে, অন্য যে সকল জিনিসের প্রয়োজন ছিল আমাদের, তা সমস্ত কিছুই আমাদের জন্মের পূর্বেই সরবরাহ করা হয়েছে আমাদের জন্যে। এবং এ সমস্ত কিছুই করা হয়েছে সেই সময়ে যখন আমাদের নিজেদের না কোন অস্তিত্ব ছিল না, আমাদের কোন কর্ম বা আমল ছিল। কে বলতে পারে যে, সূর্যকে আমারই কর্মের ফলস্বরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে, পৃথিবীকে আমার সৎকর্মের ফলেই সৃষ্টি করা হয়েছে? সংক্ষেপে, এ হচ্ছে সেই রহমত, যা মানুষ

ও তার কর্মের পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। যা কারো কোন কর্মের ফল নয়।

(২) দ্বিতীয় প্রকারের রহমত হচ্ছে সেই রহমত যা কর্মের ফলস্বরূপ প্রকাশ পায় এবং এর কোন বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

কুরআন শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে যে, খোদাতাআলার সত্তা প্রত্যেক প্রকারের দোষত্রুটি থেকে পবিত্র এবং প্রত্যেক প্রকারের ক্ষতি থেকে মুক্ত। এবং তিনি চান যে, মানুষও তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করে দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র হোক। তাই তিনি বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ থাকবে সে পরজগতেও অন্ধ হবে" (১৭ঃ৭৩)। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ থাকবে এবং সেই অনুপম সত্তাকে দেখতে পাবে না, সে মরণের পরেও অন্ধই হবে এবং অন্ধকার তার থেকে দূরীভূত হবে না। কেননা, খোদাকে দেখার ইন্দ্রিয়সমূহ ইহজগতেই পাওয়া যায় এবং যে ব্যক্তি এই ইন্দ্রিয়সমূহকে এই দুনিয়া থেকে সঙ্গে করে নিয়ে না যাবে, সে আখেরাতেও খোদাকে দেখতে পাবে না। এই আয়াতে খোদাতাআলা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের কোন্ উন্নতি তিনি চান। এবং মানুষ তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করলে কত উর্ধ্বে উন্নীত হতে পারে। অতঃপর, তিনি কুরআন শরীফে সেই শিক্ষা পেশ করেছেন যার মাধ্যমে এবং যার উপরে আমল করলে এই দুনিয়াতেই দীদার-ই-ইলাহী বা খোদার দর্শন লাভ করা সম্ভব হতে পারে। যেমন, তিনি বলেছেনঃ

"সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রভু-প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎ বা দীদার লাভ করবার আশা রাখে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রভু-প্রতিপালকের এবাদতের মধ্যে যেন কাউকেও শরীক না করে" (১৮ ঃ ১১১)।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি চায় যে, এই দুনিয়াতেই তার সেই খোদার দীদার লাভ হোক যিনি সত্যিকার খোদা ও সৃষ্টিকর্তা, তাহলে তার উচিত এমন সব সৎকর্ম করা যার মধ্যে কোন প্রকারের কোন ত্রুটি ও কালিমা থাকবে না। অর্থাৎ, তার আমল বা কর্ম এমন হতে হবে যে, তার মধ্যে না থাকবে কোন লোক দেখানোর ভাব বা ইচ্ছা, না তার দ্বারা তার মনে এমন কোন অহংকার সৃষ্টি হবে যে, 'আমি এ-ই হয়েছি, সে-ই হয়েছি। এবং তার সেই আমল না ত্রুটিযুক্ত হবে, না অসম্পূর্ণ থাকবে। না তার মধ্যে এমন কোন দুর্গন্ধ মিশ্রিত থাকবে যা কিনা তার ব্যক্তিগত ভালবাসার পরিপন্থী হবে। বরং, তা হতে হবে আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততায় পরিপূর্ণ। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-ও হতে হবে যে, তা সর্বপ্রকারের শিরক্ থেকে সম্পূর্ণমুক্ত হয়। না সূর্য, না চন্দ্র, না আকাশের তারা, না বাতাস, না আগুন, না পানি, না পৃথিবীর অন্য কোন বস্তুকে উপাস্য করা হয়। এবং পৃথিবীস্থ উপায় উপকরণকে এমন ইজ্জত বা গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সেগুলোর প্রতি এমন ভরসা করা হয়ে যাতে মনে হয় যে, ওগুলি খোদারই অংশীদার। এবং না নিজের হিম্মত ও প্রচেষ্টাকে কিছু একটা মনে করা হয়। এবং না নিজের হিম্মত ও প্রচেষ্টাকে কিছু একটা মনে করা হয়। কেননা, এটাও বিভিন্ন প্রকার শিরকের মধ্যে এক প্রকার শির্ক। বরং সমস্ত কিছু, সমাধান করা পর এটাই মনে করা করতে হবে যে, আমি কিছুই করিনি। এবং না নিজের জ্ঞানের জন্য গর্ব করা যাবে, না নিজের কোন কাজের জন্য আনন্দ-উল্লাস। বরং, নিজেকে একজন অজ্ঞ বলেই জানবে, দুর্বল জানবে এবং খোদাতাআলার আস্তানায় সর্বদা আত্মনিবেদিত থাকবে এবং খোদাতাআলার আস্তানায় সর্বদা আত্মনিবেদিত থাকবে এবং প্রার্থনার সঙ্গে তাঁর কৃপা ও করুণাকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করবে। এবং সেই ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে যে দারুণভাবে পিপাসার্ত এবং হাত-পা না থাকা এক অসহায় ব্যক্তি, এবং তার সামনেই ফুটে ওঠলো এক প্রস্রবণ যার পানি অত্যন্ত সাফ ও সুমিষ্ট। কে তখন মাটিতে বুক ঘঁষে ঘঁষে অতিকষ্টে সেই প্রস্রবণের কাছে গিয়ে পৌঁছুলো এবং নিজের ঠোঁট দু'টিকে প্রস্রবণের পানির 'পরে রাখলো এবং মুখ তুললো না, যতক্ষণ না সে পরিতৃপ্ত হলো।

কুরআন করীমে আমাদের খোদা তাঁরে গুণাবলী সম্পর্কে বলছেন, "বল, তিনিই আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ স্বনির্ভর ও সর্বনির্ভরস্থল। তিনি কাউওকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই" (১১২ঃ ২-৫)। অর্থাৎ তোমার খোদা হচ্ছেন সেই খোদা যিনি তাঁর সত্তায় এবং গুণাবলীতে এক-অদ্বিতীয়। না কোন সত্তা তাঁর সত্তার ন্যায় চিরন্তন ও চিরস্থায়ী অর্থাৎ অনাদি ও অনন্ত; না কোন কিছুর গুণাবলী তাঁর গুণাবলীর ন্যায় (অনুপম)। মানুষের জ্ঞান কোন শিক্ষকের মুখাপেক্ষী এবং তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু, তার জ্ঞান কোন শিক্ষাদাতার মুখাপেক্ষী নয় এবং তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু, তার জ্ঞান কোন শিক্ষাদাতার মুখোপেক্ষী নয় এবং তা কল্পনাতাতীভাবে সীমাহীন। মানুষের শ্রবণ শক্তি বাতাসের মুখাপেক্ষী এবং সীমিত। কিন্তু, খোদার শ্রবণশক্তি তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতার অন্তর্গত এবং তা সীমিত নয়। মানুষের দর্শনশক্তি সূর্য কিংবা অন্য কোন আলোকের মুখাপেক্ষী। এবং তা সীমিত। কিন্তু, খোদার দর্শনশক্তি তাঁর ব্যক্তিসত্তার আলো থেকেই (শক্তিমান) এবং তা সীমিত নয়। তাঁর সমস্ত গুণাবলী অতুল ও অনন্য। তাঁর যেমন কোন মেছাল বা তুলনা নেই, তেমনি তাঁর গুণাবলীরও কোন তুলনা নেই। তাঁর যদি কোন একটি গুণও ত্রুটিযুক্ত হয়, তাহলে তাঁর সমস্ত গুণাবলী ত্রুটিযুক্ত হবে। এজন্যই তাঁর একত্ব বা তৌহীদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, যতক্ষণ না তিনি তাঁর সত্তার মতই তাঁর সমস্ত গুণবালীতেও অতুল ও অন্যন্য হবেন। এছাড়া, উল্লিখিত আয়াতসমূহে এ কথাও বলা হয়েছে যে, খোদা না কারো পুত্র, না কেউ তাঁর পুত্র। কেননা, তিনি তাঁর সত্তায় স্বনির্ভর। তাঁর না কোন পিতার প্রয়োজন আছে, না পুত্রের। এই-ই হচ্ছে তৌহীদ যা কুরআন শরীফ শিক্ষা দিয়েছে এবং যা ঈমান এর ভিত্তি"। -(লেকচার লাহোর, পৃঃ ৯-১৩)

(ক্রমশঃ)

সংকলন ও অনুবাদ ঃ শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

যারা আকিকার জন্যে দোয়া চাচ্ছেন ঃ
পিতা-ক্যাপ্টেঃ নাসীরুল হক
সন্তান-মোবারিজ আহমদ

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212
TEL : 884724, 872220, 884076, Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

STAR

VELTEX

VELTEX TEXTILE MILLS LTD.

(ONLY VELVET FABRIC MANUFACTURER AND EXPORTER IN BANGLADESH.)

PRODUCTS RENGE : VELVET, JACQUARD, MICROFILAMENT & OXFORD FABRIC

MILL ADDRESS :
JANGALIA, SHAKTALA, COMILLA
BANGLADESH TEL : 880-2-8906

DHAKA OFFICE:
HOUSE 307 ROAD 21
NEW D. O.H.S. MOHAKHALI
DHAKA-BANGLADESH.
TEL : 880-2-887325, 871856
CELLULAR : 854105
FAX : 880-2-871856

USA OFFICE :
1426 RAMONA AVENUE SUITE-410
CHINO HILLS, CA 91710 USA
TEL : (909) 393-4737
FAX : (09) 393-4720, (909) 597-4696
E-MAL: JAMALIN @ AOL COM@ INET #

OTHER BUSINESSES :

- **MACHINETECH BANGLADESH LTD.** (TEXTILE MACHINERIES INDENTOR)
- **BANGLADESH JUTE TRADING CORPORATION** (JUTE GOODS EXPORTER)
- **LABSOURCE INTERNATIONAL** (MEDICAL EQUIPMENTS IMPORTER)
- **JAM GROUP OF COMPANIES BANGLADESH** (IMPORT-EXPORT & INTL. TRADING)
- **BANGLADESH SPINING MILLS LTD.** (PROPOSSED)

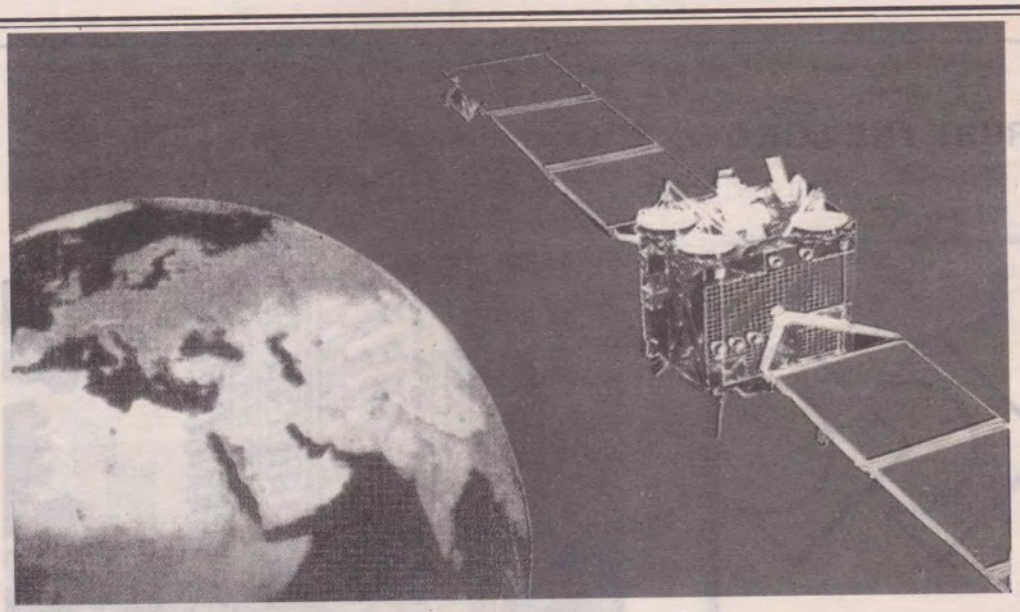

এমটিএ অহোরাত্র
দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

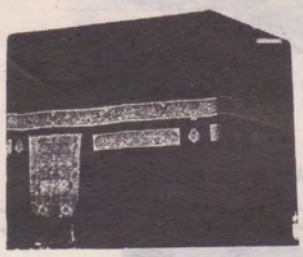

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

Muslim TV
AHMADIYYA
INTERNATIONAL

MTA AUDIO CHANNELS

- Main : 6.50 MHz
- English : 7.02 MHz
- Arabic : 7.20 MHz
- Bangla : 7.38 MHz
- French : 7.56 MHz
- German : 7.74 MHz
- Indonesian : 7.92 MHz
- Turkee : 8.10 MHz.

- এমটিএ MTA আন্তর্জাতিক স্যাটালাইট টেলিভিশন সর্বক্ষণ খাঁটি ইসলাম প্রচারে রত একমাত্র টিভি চ্যানেল।
- সারা বিশ্বে এই চ্যানেল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানাদি প্রচার করে থাকে।
- এমটিএ MTA একমাত্র টিভি নেটওয়ার্ক যাতে মূল অডিও চ্যানেলসহ মোট ৮টি ভাষায় অডিও চ্যানেল বিদ্যমান।
- বর্তমানে এই চ্যানেল দৈনিক এক ঘন্টা বাংলাদেশের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চার বার বাংলায় বিশ্ব সংবাদ প্রচার করে চলেছে।
- প্রতিদিন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর সহিত প্রশ্নোত্তর সেশন 'লিকা-মাআল আরব' দেখুন।
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর খুৎবাহ শুনুন।

আপনার বাড়ীতে এমটিএ MTA-এর সংযোগ নিন।
নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।
বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

এমটিএ MTA: ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

প্রথম মুসলিম নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ডঃ আবদুস সালাম

প্রফেসর ডঃ আবদুস সালামকে প্রদত্ত নোবেল পুরস্কারের সনদ

স্পেনের 'মসজিদে বাশারত'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষন দিচ্ছেন প্রফেসর ডঃ আবদুস সালাম। সভাপতিত্ব করছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে'(আইঃ)। তাঁর পাশে উপবিস্ট আছেন হযরত চৌধুরী স্যার মুহম্মদ জাফরুল্লাহ খান(রাঃ)

রাবওয়ায় মরহুম প্রফেসর ডঃ আবদুস সালাম-এর নামাযে জানাযা আদায়ের দৃশ্য

তিনি আসলেন , বিজ্ঞান প্রযুক্তির জগতে কম্পন সৃষ্টি করলেন এবং প্রভূর নিকট ফিরে গেলেন

New Vol. No. 59 ● 15th & 16th Issue 15th February 1998

Fortnightly The AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

QUALITY IS OUR TRADITION

AMECON
এমিকন

HEAD OFFICE : H-79/3, BLOCK-E, BANANI CHAIRMAN BARI, DHAKA-1213, BANGLADESH, TELEFAX : 880-2-884945, TEL : 605331

BRANCH OFFICE : 205, BAIZID BOSTAMI ROAD, BAIZID BOSTAMI , CHITTAGONG. PHONE : 682216

SPECIALIST IN ADVERTISING, DESIGN, PRINTING HOARDING, DECORATION, PLASTIC & METAL SIGN ARMY CRESTS, WOODEN & STEEL, FABRICATION WORK, SCULPTURE & MODELING.

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272